নূতন মাধ্যমিক ভূগোল

Recommended by the West Bengal Board of Secondary Education as a Text Book for Class IX, vide Notification No. TB/74/IX/G/51 and also Board's letter No. 10367/G dated 24.11.75

নূতন মাধ্যমিক ভূগোল

[প্রথম খণ্ড]

(নবম শ্রেণীর জন্য)

অধ্যাপক পি. সি. চক্রবর্তী, এম. এস-সি. (ভূগোল)
(টিচার্স ট্রেনিং সার্টিফিকেট—ভূগোল ও বিজ্ঞান)
অধ্যাপক, সিটি কলেজ কলিকাতা; অবসরপ্রাপ্ত উপাধ্যক্ষ,
সিটি কলেজ অব্ কমার্স এ্যাণ্ড বিজনেস্ এ্যাডমিনিস্ট্রেশন
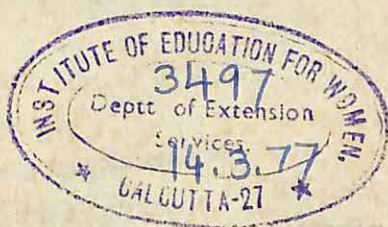
ওরিয়েণ্টাল বুক কোম্পানী
৫৬ সূর্য সেন স্ট্রীট, কলিকাতা-৯

প্রকাশক :
শ্রীকৃপেশচন্দ্র ভট্টাচার্য, বি. এ.
ওরিয়েণ্টাল বুক কোম্পানী
৫৬, সূর্য সেন স্ট্রীট, কলিকাতা-৯

প্রথম সংস্করণ : ডিসেম্বর, ১৯৭৩
দ্বিতীয় সংস্করণ : ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৪
তৃতীয় সংস্করণ (সংশোধিত) : জুলাই ১৯৭৫
চতুর্থ সংস্করণ (সংশোধিত) : ডিসেম্বর, ১৯৭৫
পঞ্চম সংস্করণ (সংশোধিত) : ডিসেম্বর, ১৯৭৬

মূল্য : তিন টাকা তেইশ পয়সা

মুদ্রাকর :
শ্রীভূমি মুদ্রণিকা
৭৭, লেনিন সরণী, কলিকাতা-১৩

[ভারত সরকারের সহায়তায় প্রাপ্ত স্বল্প মূল্যের কাগজে এই পুস্তক মুদ্রিত ।]

সূচীপত্র

পৃষ্ঠা

প্রথম পরিচ্ছেদ ঃ

ভৌগোলিক অঞ্চলের তাৎপর্য—বিশেষতঃ ভারত সম্পর্কে ... ১

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ঃ

ভারতের বিশেষ বিশেষ ভৌগোলিক অঞ্চলসমূহের বিবরণ ... ৯

প্রথম পাঠ ঃ হিমালয় ৯

পশ্চিম হিমালয় ... ১৩

পূর্ব হিমালয় ... ১৮

দ্বিতীয় পাঠ ঃ গাঙ্গেয় সমভূমি ২৬

১। উচ্চ গাঙ্গেয় সমভূমি ... ২৮

২। মধ্য গাঙ্গেয় সমভূমি ... ৩৩

৩। নিম্ন গাঙ্গেয় সমভূমি ... ৩৮

তৃতীয় পাঠ ঃ মরুভূমি অঞ্চল ... ৪৮

চতুর্থ পাঠ ঃ কচ্ছ ও কাথিওয়াড় উপদ্বীপ ... ৫৩

পঞ্চম পাঠ ঃ দাক্ষিণাত্যের মালভূমি ৫৮

১। দাক্ষিণাত্যের উত্তর-পার্বত্য অঞ্চল ... ৫৮

২। লাভা অঞ্চল ... ৬১

৩। দাক্ষিণাত্যের প্রকৃত মালভূমি ... ৬৪

৪। দাক্ষিণাত্যের সমভূমি ... ৬৯

ষষ্ঠ পাঠ ঃ পূর্ব উপকূলের সমভূমি ... ৭৪

(ক) উত্তর সরকার তটভূমি ... ৭৫

(খ) করমণ্ডল তটভূমি ... ৭৭

সপ্তম পাঠ ঃ পশ্চিম উপকূলের সমভূমি ... ৭৯

(ক) কঙ্কণ তর্টভূমি ... ৮০

(খ) মালাবার তটভূমি ... ৮১

অষ্টম পাঠ ঃ ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা ... ৮৪
নবম পাঠ ঃ উত্তর-পূর্ব ভারতের পার্বত্য রাজ্যসমূহ ... ৯১
মেঘালয় ... ৯২
নাগাল্যাণ্ড ... ৯৫
মণিপুর ... ৯৮
ত্রিপুরা ... ১০১
পরিশিষ্ট ঃ কয়েকটি ভৌগোলিক পারিভাষিক শব্দের সংজ্ঞা ... ১০৬

SYLLABUS IN GEOGRAPHY

CLASS—IX

1. Meaning of the Geographical regions with particular reference to India.
2. Account of the undernoted major Geographical regions of India :
   (a) The Himalayas (b) The Ganga Plains (Upper, Middle and Lower with emphasis on the lower Ganga plains—i.e. West Bengal).
   (c) The Desert. (d) Kutch and Kathiawar Peninsula.
   (e) The Deccan Plateau—including the Lava Region, Mysore Plateau & Chotonagpur Plateau.
   (f) Eastern Coastal Plains (including the deltas of the Mahanadi, the Godavari, the Krishna and the Cauvery).
   (g) Western Coastal Plains.
   (h) The Brahmaputra Valley.
   (i) Hilly States of N.E. India (Meghalaya, Nagaland, Manipur and Tripura).

প্রথম পরিচ্ছেদ

ভৌগোলিক অঞ্চলের তাৎপর্য

(বিশেষতঃ ভারত সম্পর্কে)

(Meaning of Geographical regions with particular reference to India)

সূচনা ঃ ভারত একটি বিশাল দেশ। ইহা এশিয়া মহাদেশের দক্ষিণাংশে অবস্থিত। ইহাকে একটি উপ-মহাদেশ বলা চলে। আয়তনে ভারত পৃথিবীর রাষ্ট্রগুলির মধ্যে সপ্তম স্থান অধিকার করে; কিন্তু জনসংখ্যায় ইহার স্থান দ্বিতীয়। এই দেশের পরিপ্রেক্ষিতে আমরা ভৌগোলিক অঞ্চলের তাৎপর্য আলোচনা করিব।
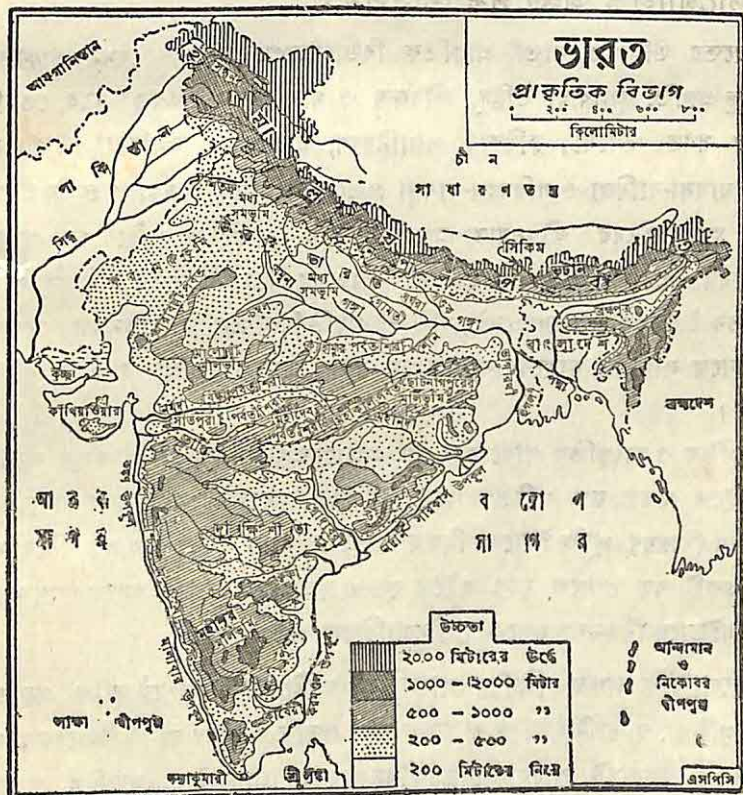
ভূগঠন ও শিলাস্তরবিন্যাস অনুসারে ভারতকে মোটামুটিভাবে দুইটি বিশেষ ভাগে বিভক্ত করা যায়। এই দুইটি বিভাগ—(ক) **উত্তর ভারত** বা **আর্যাবর্ত** এবং (খ) **দক্ষিণাপথ** বা **দাক্ষিণাত্য**।

(ক) উত্তর ভারতের প্রাকৃতিক বিভাগঃ ভূ-প্রকৃতি অনুসারে উত্তর ভারতকে মোটামুটি চারটি ভাগে বিভক্ত করা যায়, যথা—(১) **উত্তরের পার্বত্য অঞ্চল**; পার্বত্য অঞ্চলের দক্ষিণে (২) **মধ্যসমভূমি অঞ্চল**—এই অঞ্চলটি নদীমাতৃক; মধ্যসমভূমির দক্ষিণ-পশ্চিমে (৩) **স্বল্পবৃষ্টির মরুভূমি অঞ্চল** এবং মধ্যসমভূমির দক্ষিণ-পূর্বাংশে (৪) বঙ্গোপসাগরের উপকূলে স্বল্প উচ্চতাবিশিষ্ট **ব-দ্বীপের তটভূমি**।

(খ) দাক্ষিণাত্যের প্রাকৃতিক বিভাগঃ দাক্ষিণাত্যের ভূ-প্রকৃতির বৈশিষ্ট্য সহজেই চোখে পড়ে। এক কথায় বলা চলে, দাক্ষিণাত্য (৫) **মালভূমি**, (৬) **তটভূমি** ও (৭) **দ্বীপসমূহের** সমন্বয় মাত্র।

ভৌগোলিক অঞ্চলের তাৎপর্যঃ

ভারতের উল্লিখিত সাতটি প্রাকৃতিক বিভাগের প্রত্যেকটিতে যেমন প্রাকৃতিক অবস্থা, ভূ-প্রকৃতি, জলবায়ু, উদ্ভিদ্, জীবজন্তু ও খনিজ সামগ্রী একরূপ নহে, তেমনি ভারতের সর্বত্র জলসেচ, কৃষিকার্য, বন্যানিয়ন্ত্রণ, বাঁধ-প্রকল্প, জলবিদ্যুৎ উৎপাদন, শ্রমশিল্প, ব্যবসা-বাণিজ্য ও পরিবহণ-ব্যবস্থা প্রভৃতি সাংস্কৃতিক কার্যকলাপও একপ্রকার নহে। অধিবাসীদের জীবনযাত্রা-প্রণালীর উপর প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রভাব অপরিসীম। প্রকৃতি হইতে মানুষ জীবনধারণের নানা উপকরণ সহজেই পায়, আর কতক উপকরণ নিজেদের চেষ্টা, বুদ্ধি ও প্রযুক্তিবিদ্যাবলে প্রয়োজনমত রদবদল করিয়া কাজে লাগায়। মানুষের সংস্কৃতিবলে সৃষ্ট পরিবেশ সাংস্কৃতিক পরিবেশ বলিয়া পরিচিত।

প্রাকৃতিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশের যুগ্ম প্রভাবের ফলে এক-একটি অঞ্চল অন্যান্য অঞ্চল হইতে স্বতন্ত্র রূপ পরিগ্রহ করে। বিভিন্ন অঞ্চলের প্রাকৃতিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশের বিশ্লেষণ পূর্বক ইহাদের নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের মধ্যে সমতা ও সাদৃশ্য বিবেচনা করিয়া একটি বড় দেশকে বৃহৎ হইতে ক্ষুদ্র ও ক্ষুদ্রতর কতকগুলি অঞ্চলে ভাগ করা যায়। এইভাবে বিভক্ত অঞ্চলকে **ভৌগোলিক অঞ্চল** বলে।

ভৌগোলিক অঞ্চল নির্ণয়ে প্রাকৃতিক পরিবেশ—ধরাপৃষ্ঠে ভূমির প্রকৃতি, জলবায়ু, মৃত্তিকা, স্বাভাবিক উদ্ভিদ্ ও খনিজ দ্রব্য প্রভৃতি প্রকৃতির দান। উহাদের মধ্যে ভূ-প্রকৃতি ও জলবায়ুই অধিবাসীদের জীবনযাত্রা-প্রণালীর উপর সর্বাধিক প্রভাব বিস্তার করে। প্রাকৃতিক পরিবেশ অর্থাৎ ভূ-গঠন, ভূমির প্রকার, জলবায়ু, মৃত্তিকা প্রভৃতি দেশের সর্বত্র একপ্রকার নহে। তবে সামান্য কিছু প্রভেদ থাকিলেও বেশ একটানা কিছুটা অঞ্চল জুড়িয়া ঐগুলিতে মোটামুটি একটা সাদৃশ্য থাকে এবং অধিবাসীদের

জীবনযাত্রা-পদ্ধতিও প্রায় একই ধরনের হয়। দুইটি অঞ্চলের দূরত্ব এবং প্রাকৃতিক পরিবেশের পার্থক্যও অঞ্চল দুইটির অধিবাসীদের জীবনযাত্রা-পদ্ধতির পার্থক্য ঘটায়। নিম্নের উদাহরণগুলি হইতে বিষয়টি ভালভাবে বুঝা যাইবে।

পশ্চিমবঙ্গের বেশীর ভাগই উর্বর পলিমাটির সমভূমি। গ্রীষ্মে—মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে এখানে পর্যাপ্ত বৃষ্টি হয়। এই কারণে এখানে কৃষিকার্য সহজ ও ফলন অধিক হয়; তাই পশ্চিমবঙ্গের অধিবাসীরা কৃষিনির্ভর। ভাত তাহাদের প্রধান খাদ্য। কৃষির প্রয়োজনে তাহারা স্থায়িভাবে এক স্থানে বাস করে এবং গ্রাম ও শহর গড়িয়া তোলে।

হিমালয়ের কুমায়ুন অঞ্চলে পাহাড়ের গায়ে কৃষিকার্য সহজ নয়। কঠিন পরিশ্রমে পাহাড়ের গায়ে ধাপ কাটিয়া কিছু কিছু চাষ-আবাদ হয়। সেখানে আবার বৃষ্টিপাতও পরিমিত নয়। ঐ অঞ্চলে কৃষি হইতে সারা বৎসরের খাদ্য জোটে না। তাই সেখানকার অধিবাসীরা জীবিকার জন্য পশুপালন করে। তাহারা বৎসরের অধিকাংশ সময় গ্রাম হইতে দূরে পাহাড়ের ঢালে পশুচারণ করিয়া বেড়ায়। তাহারা অর্ধ-যাযাবর। তাহাদের খাদ্যের একটা বড় অংশ পশুজাত দ্রব্য। পোষাকেও বাঙ্গালীদের সঙ্গে তাহাদের অনেক পার্থক্য। শীতপ্রধান পার্বত্য অঞ্চলের উপযোগী গরম পোষাক তাহারা পরিধান করে।

উপরের দৃষ্টান্ত হইতে দেখা যায়, পরিবেশের বিভিন্নতায় মানুষের জীবনযাত্রা-পদ্ধতিতে যেমন পার্থক্য ঘটে, একইরূপ পরিবেশ মানুষের জীবনযাত্রা-প্রণালীতেও তেমনি সাদৃশ্য সৃষ্টি করে। মানুষের জীবনযাত্রা-প্রণালীতে এইরূপ সাদৃশ্য বা সমতা লক্ষ্য করিয়াই এক-একটি ভৌগোলিক অঞ্চল নির্ধারিত হয়। এইরূপ অঞ্চল নির্ধারণে মানুষের অর্থনৈতিক ও সামাজিক কাজকর্মও গুরুত্বপূর্ণ।

ভৌগোলিক অঞ্চল নির্ণয়ে সাংস্কৃতিক পরিবেশ—সভ্যতার প্রথম অবস্থায় মানুষ প্রকৃতির উপর বেশী পরিমাণে নির্ভরশীল ছিল। সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে মানুষ প্রাকৃতিক পরিবেশকে ক্রমশঃ কিছু পরিমাণে নিয়ন্ত্রণ করিতে পারিতেছে। যেমন, খরাপীড়িত অঞ্চলে জলসেচের সাহায্যে ফসল উৎপাদন করিয়া মানুষ জলবায়ুর বিরূপতাকে কোথাও কোথাও কিছুটা এড়াইতে পারিয়াছে; পর্বতে সুড়ঙ্গ কাটিয়া, এবং নদীর উপর সেতু নির্মাণ করিয়া যোগাযোগ-ব্যবস্থার উন্নতিসাধন করিয়াছে; জমিতে সার দিয়া কোথাও কৃষির উৎপাদন বৃদ্ধি করিয়াছে; কোথাও জলপ্রপাত হইতে বা নদীতে বাঁধ দিয়া বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদন করিয়া শিল্প কারখানা স্থাপন করিয়াছে। মানুষ এইভাবে প্রাকৃতিক পরিবেশকে কিছুটা পরিবর্তিত করিয়া নিজস্ব একটা অর্থনৈতিক পরিবেশ সৃষ্টি করিয়াছে। সমাজ-ব্যবস্থার উন্নতির দ্বারা মানুষ বিভিন্ন অঞ্চলে বিশেষ বিশেষ সামাজিক পরিবেশ রচনা করিয়াছে। এইরূপ মনুষ্যসৃষ্ট

কৃষি, শ্রমশিল্প পরিবহণ, ও ব্যবসা-বাণিজ্য, প্রশাসনিক ব্যবস্থা, গবেষণা ও প্রযুক্তি বিদ্যার দ্বারা রচিত অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিবেশকে **সাংস্কৃতিক পরিবেশ** বলে।

মানবজীবনের উপর পরিবেশের প্রভাব ঃ ইতিপূর্বে আমরা দেখিয়াছি যে, মানুষের জীবনধারা গঠনে মুখ্যতঃ দুই প্রকার পরিবেশ প্রভাব বিস্তার করে—(১) প্রাকৃতিক পরিবেশ ও (২) সাংস্কৃতিক পরিবেশ।

প্রাকৃতিক পরিবেশের বিশেষ উপাদান দুইটি—(১) ভূ প্রকৃতি ও (২) জলবায়ু। ভারতের মত বিরাট দেশে ভূপ্রকৃতি ও জলবায়ুর নানারূপ বৈচিত্র্যময় সমাবেশ দেখা যায়। একদিকে যেমন উচ্চ হিমালয়ের চিরতুষারাবৃত গিরিশৃঙ্গ, অপরদিকে তেমনি রাজস্থানের প্রচণ্ড উষ্ণ মরু অঞ্চল। এক দিকে পূর্ব হিমালয়ের পাদদেশের গভীর গহন অরণ্যানী—তরাই অঞ্চল, অপরদিকে অন্ধ্র ও কর্ণাটকের বৃক্ষহীন মালভূমি অঞ্চল। এইরূপ বৈচিত্র্য শুধু দূরবর্তী অঞ্চলেই নহে, নিকটবর্তী অঞ্চলেও দৃষ্ট হয়। যেমন, কঠিন শিলাময় ছোটনাগপুর মালভূমি অঞ্চলের পাশে নরম পলিমাটি-গঠিত সুবিস্তৃত গাঙ্গেয় সমভূমি অঞ্চল বিদ্যমান।

এই বৈচিত্র্যপূর্ণ বিভিন্নরূপ প্রাকৃতিক পরিবেশকে মানুষ নিজের কাজে ব্যবহার করিয়া চলিয়াছে। অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক নানা ক্রিয়াকলাপের মাধ্যমে মানুষ এই পরিবেশ হইতেই নিজেদের খাদ্য, পরিধেয়, গৃহনির্মাণ সামগ্রী প্রস্তুত করে এবং প্রকৃতি হইতে নানাবিধ সম্পদ সংগ্রহ করিয়া মানবজাতির সভ্যতার অগ্রগতি সুদৃঢ় করিতেছে। এইভাবেই মানুষ সৃষ্টি করিয়াছে নিজেদের সাংস্কৃতিক পরিবেশ। প্রাকৃতিক পরিবেশের উপর নির্ভর করিয়া কোন অঞ্চলে গড়িয়া উঠিয়াছে পশুপালক সমাজ—সেখানে পার্বত্য পরিবেশে স্বাভাবিক তৃণক্ষেত্রের সুযোগ লাভ করিয়া পশুপালন ও আনুষঙ্গিক ক্রিয়াকলাপই মানুষের মুখ্য জীবিকা। আবার কোথাও গড়িয়া উঠিয়াছে কৃষিভিত্তিক মনুষ্য-সমাজ, সেখানে কৃষিকর্মের জন্য নদীবিধৌত সমতল পলিমাটির প্রান্তর, সুষম বৃষ্টিপাত, সেচের সুব্যবস্থা ইত্যাদি সহজলভ্য। কোথাও শিল্পের কাঁচামাল সহজলভ্য, শ্রমিক ও বিদ্যুৎশক্তির উপর নির্ভর করিয়া বৃহৎ শিল্পকেন্দ্র ও শিল্পজীবী সমাজ গড়িয়া উঠিয়াছে। মানুষ নিজের প্রয়োজনে যোগাযোগ ও যাতায়াতের সুবিধার জন্য রাস্তাঘাট ও যানবাহন নির্মাণ করিয়াছে। নদী ও সাগরের তটে বন্দর গড়িয়া তুলিয়াছে।

পরিবেশে লভ্য প্রাকৃতিক সম্পদের সুষ্ঠু আহরণ ও উহার সদ্ব্যবহারের জন্য যে সব কার্যাবলী প্রয়োজন সেগুলিকে কেন্দ্র করিয়াই অঞ্চলবিশেষের মানুষের জীবনযাত্রা আবর্তিত হইতেছে। মানুষ আপন সৃজনশীলতায় নিত্য নূতন যন্ত্রাদি আবিষ্কার করিয়া প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবহার করিতেছে এবং প্রয়োজনীয়

ভোগ্যপণ্য উৎপাদন করিতেছে। প্রতিটি অঞ্চলেই এইভাবে প্রাকৃতিক পরিবেশের সহিত সাংস্কৃতিক পরিবেশের সমন্বয় ঘটিয়াছে। তবে এই সমন্বয় সর্বত্র একইভাবে ঘটে নাই—অঞ্চলভেদে ইহার বিভিন্নতা লক্ষণীয়। সেই কারণেই গাঙ্গেয় সমভূমি অঞ্চলের কৃষিকার্যের প্রকৃতি ও মানুষের জীবনধারার সহিত দাক্ষিণাত্যের মালভূমি অঞ্চলের কৃষি ও জীবনধারার পার্থক্য রহিয়াছে। মরু অঞ্চলের জীবনযাত্রা-প্রণালীর সহিত পার্বত্য অঞ্চলের জীবনযাত্রা-প্রণালীর পার্থক্য অনেক। কাজেই ইহা বলা যায় যে প্রাকৃতিক পরিবেশ দ্বারা অর্থনৈতিক কর্মধারা নিয়ন্ত্রিত হইতেছে এবং এই ভাবেই মানুষের জীবনধারাও পরিবেশের দ্বারা প্রভাবান্বিত হইতেছে।

ভৌগোলিক অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য : একটি ভৌগোলিক অঞ্চলের মানুষের জীবনযাত্রা-প্রণালী ইহার পার্শ্ববর্তী বা দূরবর্তী অন্য ভৌগোলিক অঞ্চলের মানুষের জীবনযাত্রা প্রণালী হইতে পৃথক। প্রাকৃতিক পরিবেশের বিভিন্নতা ও বৈচিত্র্যই বিভিন্ন ভৌগোলিক অঞ্চলের মধ্যে পার্থক্যের কারণ।

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, এক-একটি ভৌগোলিক অঞ্চলের এমন এক-একটি স্বাতন্ত্র্য বা বিশেষ রূপ আছে যাহা দ্বারা অন্য অঞ্চল হইতে ইহাকে পৃথক করা যায়। এক-একটি ভৌগোলিক অঞ্চল এক-একটি বিশেষ অঞ্চলেই সীমাবদ্ধ। একই ভৌগোলিক অঞ্চল ইতস্ততঃ ছড়াইয়া থাকে না। ইহা একটানা একটি অঞ্চল জুড়িয়া থাকে। তবে পার্শ্ববর্তী ভৌগোলিক অঞ্চলের সহিত ইহার সুস্পষ্ট কোন সীমারেখা থাকে না। একটি অঞ্চল হইতে উহার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে প্রবেশ করিলে অতিক্রান্ত অঞ্চলটির বৈশিষ্ট্য ক্রমশঃ অন্তর্হিত হইবে, আর সম্মুখের অঞ্চলটির বৈশিষ্ট্য ক্রমশঃ অনুভূত হইবে। পাশাপাশি দুইটি ভৌগোলিক অঞ্চলের মধ্যে একটি মধ্যবর্তী অঞ্চল থাকে যাহার মধ্যে দুইটি ভৌগোলিক অঞ্চলেরই অনুপ্রবেশ ঘটে। যেমন, উত্তর রাজ-স্থানের মরুভূমি অঞ্চলের সহিত দক্ষিণ পাঞ্জাব সমভূমি ক্রমে ক্রমে মিশিয়া গিয়াছে। ঐ দুইটি অঞ্চলের কোন সুস্পষ্ট সীমারেখা চোখে পড়ে না। এইরূপ উদাহরণ অনেক আছে।

ভৌগোলিক অঞ্চল কোন রাজনৈতিক সীমারেখা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় না। যেমন, গাঙ্গেয় সমভূমি একটি ভৌগোলিক অঞ্চল, অথচ ইহা ভারতের তিনটি অঙ্গরাজ্য—উত্তর প্রদেশ, বিহার ও পশ্চিমবঙ্গ ব্যাপিয়া বিস্তৃত।

ভৌগোলিক অঞ্চল নিরূপণের প্রয়োজনীয়তা : ভৌগোলিক অঞ্চল নিরূপণের প্রয়োজনীয়তা সুদূরপ্রসারী। কোন দেশকে ভালভাবে জানিতে হইলে উহার ভৌগোলিক অঞ্চল বিশ্লেষণের প্রয়োজন। দেশের ভৌগোলিক বিবরণ অনুধাবন করিতে হইলে ঐ দেশকে ভৌগোলিক অঞ্চলে ভাগ করিতে হইবে।

ভৌগোলিক অঞ্চলের বিবরণে আমরা সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের অধিবাসীদের জীবনধারার সহিতও পরিচিত হই। অধিবাসীরা প্রাকৃতিক পরিবেশকে কতটুকু নিয়ন্ত্রণ করিয়া
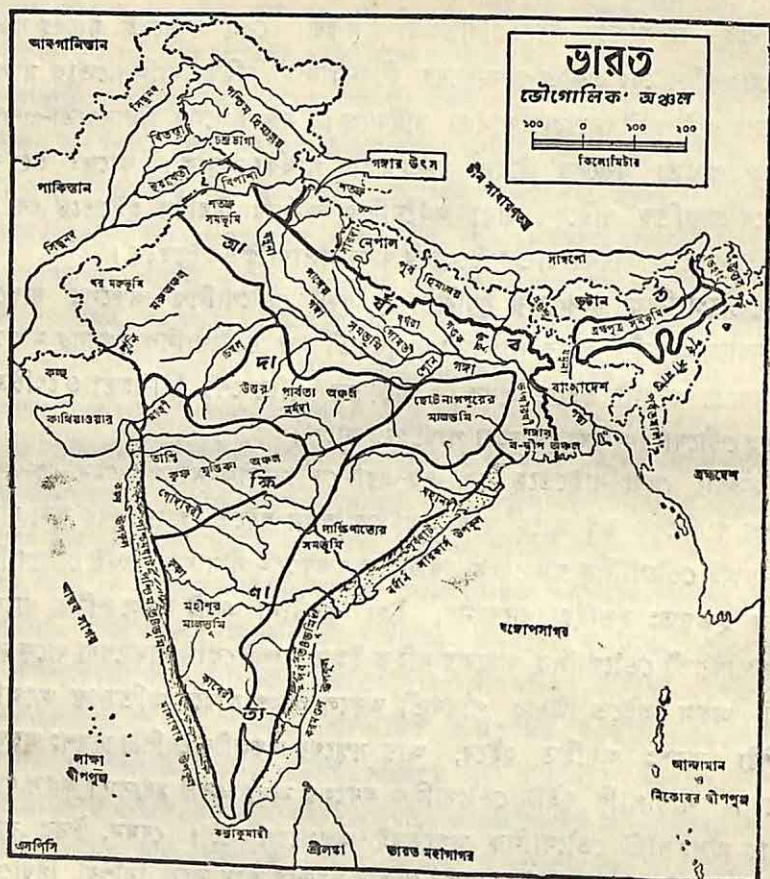
নিজেদের সুবিধা করিতে পারিয়াছে, তাহাও জানিতে পারি। ভৌগোলিক অঞ্চল বিভাগ দেশের উন্নয়নমূলক পরিকল্পনা গঠনে বিশেষভাবে সাহায্য করে।

ভারতের ভৌগোলিক অঞ্চলঃ উপরোক্ত আলোচনা হইতে বুঝা যায় যে, বিভিন্ন অঞ্চলের প্রাকৃতিক ও সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য অনুযায়ী কোন দেশকে বৃহৎ হইতে ক্ষুদ্র ও ক্ষুদ্রতর অংশে বিভক্ত করিলে যে ক্ষুদ্রতর অঞ্চলগুলি পাওয়া যায়, উহারাই ঐ দেশের ভৌগোলিক অঞ্চল। ভারতের ভূ-প্রকৃতির বৈচিত্র্য, জলবায়ুর বৈশিষ্ট্য, আঞ্চলিক অবস্থান ইত্যাদি বিবেচনা করিয়া ভারতকে প্রথমতঃ পাঁচটি বৃহৎ ভৌগোলিক অঞ্চলে ভাগ করা যায়—

(১) হিমালয় পর্বত ও তৎসংলগ্ন উত্তর-পূর্ব পাহাড়ী অঞ্চল। (২) উত্তর ভারতের বিশাল সমভূমি অঞ্চল। (৩) মধ্য ও দক্ষিণ ভারতের মালভূমি অঞ্চল। (৪) উপকূলের তটভূমি বা নিম্নভূমি। (৫) দ্বীপপুঞ্জসমূহ।

প্রাকৃতিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশের বিশেষ বিশেষ প্রভাবের ফলে এই পাঁচটি বৃহৎ ভৌগোলিক অঞ্চলকে আবার আরো কয়েকটি ক্ষুদ্র ও ক্ষুদ্রতর অঞ্চলে ভাগ করা যায়। যেমন—

(১) হিমালয় পর্বত ও তৎসংলগ্ন উত্তর-পূর্ব পাহাড়ী অঞ্চলকে

(ক) পশ্চিম হিমালয় অঞ্চল, (খ) মধ্য হিমালয় অঞ্চল, (গ) পূর্ব হিমালয় অঞ্চল, (ঘ) নাগাল্যাণ্ড, মণিপুর, মেঘালয়, মিকির পাহাড়, কাছাড়, মিজোরাম ও ত্রিপুরা-সহ উত্তর-পূর্ব পাহাড়ী অঞ্চলে।

(২) উত্তর ভারতের বিশাল সমতলভূমি অঞ্চলকে

(ক) গাঙ্গেয় সমভূমি—উচ্চ, মধ্য, নিম্ন, (খ) ব্রহ্মপুত্র সমভূমি, (গ) পাঞ্জাব-হরিয়ানা সমভূমি অঞ্চল, (ঘ) রাজস্থানের মরু অঞ্চলে।

(৩) মধ্য ও দক্ষিণ ভারতের মালভূমি অঞ্চলকে

(ক) মধ্য ভারতের মালভূমি অঞ্চল, (খ) ছোটনাগপুরের মালভূমি অঞ্চল, (গ) লাভা অঞ্চল, (ঘ) কর্নাটক মালভূমি অঞ্চল, (ঙ) অন্ধ্র মালভূমি অঞ্চল, (চ) তামিলনাড়ুর উচ্চভূমি অঞ্চল, (ছ) ওড়িষ্যার উচ্চভূমি অঞ্চলে।

(৪) উপকূলের তটভূমিকে

(ক) পশ্চিম উপকূল অঞ্চল,—কচ্ছ ও কাথিয়াবাড় উপদ্বীপ, গুজরাট সমভূমি অঞ্চল, কঙ্কন উপকূল, মালাবার উপকূল (কর্নাটক উপকূল, কেরালা উপকূল), নিম্নভূমি অঞ্চল, (খ) পূর্ব উপকূল অঞ্চল—উত্তর সরকার (উৎকল, অন্ধ্র) নিম্ন-ভূমি ও করমণ্ডল (তামিলনাড়ু) উপকূল নিম্নভূমি অঞ্চলে।

(৫) দ্বীপপুঞ্জ সমূহকে

(ক) বঙ্গোপসাগরের দ্বীপপুঞ্জ—আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ অঞ্চল, (খ) আরব সাগরের দ্বীপসমূহ—লাক্ষাদ্বীপ, আমিনদিভি ও মিনিকয় দ্বীপপুঞ্জে।

অনুশীলনী

১। ভৌগোলিক অঞ্চল কাহাকে বলে? ভৌগোলিক অঞ্চল নির্ণয়ে প্রাকৃতিক পরিবেশ ও সাংস্কৃতিক পরিবেশের গুরুত্ব আলোচনা কর। ভারতের প্রধান ভৌগোলিক অঞ্চলগুলির নাম কর।

২। ভারতের যে কোন একটি ভৌগোলিক অঞ্চলের প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য বর্ণনা কর। ঐ বৈশিষ্ট্য মানুষের জীবনযাত্রাকে কিভাবে নিয়ন্ত্রিত করে ?

৩। মানব-জীবনের উপর পরিবেশের প্রভাব সম্বন্ধে আলোচনা কর।

৪। ভারতের একটি পূর্ণপৃষ্ঠা মানচিত্র আঁকিয়া ভৌগোলিক অঞ্চলগুলি দেখাও।

৫। ভারতের রেখামানচিত্রে নিম্নলিখিত অঞ্চলগুলি দেখাও—
মরু অঞ্চল, পশ্চিম উপকূলের নিম্নভূমি অঞ্চল, গাঙ্গেয় সমভূমি অঞ্চল, পূর্ব হিমালয় অঞ্চল, কঙ্কন উপকূল অঞ্চল।

৬। প্রাকৃতিক অঞ্চল ও ভৌগোলিক অঞ্চল—উভয়ের পার্থক্য কোথায় ? উভয় অঞ্চলের সাদৃশ্য দেখাইয়া ভৌগোলিক অঞ্চলের অবদান বর্ণনা কর।

৭। ভারতের প্রাকৃতিক অঞ্চল ও ভৌগোলিক অঞ্চল সংক্ষেপে লিখ।

৮। ভারতের মধ্যের সমভূমি বা উত্তরের পার্বত্য অঞ্চল—প্রাকৃতিক বিভাগ না ভৌগোলিক অঞ্চল ? উহাদের ছোট ছোট ভাগ নির্ণয় করিয়া প্রত্যেকটির স্তর কি লিখ।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ভারতের বিশেষ বিশেষ ভৌগোলিক অঞ্চলসমূহের বিবরণ

প্রথম পাঠ

হিমালয় অঞ্চল

সাধারণ বিবরণঃ ভারতের উত্তরদিকে অবস্থিত **পামীর মালভূমি পৃথিবীর ছাদ** নামে অভিহিত। পামীর মালভূমি হইতে এশিয়া মহাদেশের মধ্যভাগে অবস্থিত মধ্য-পর্বতমালা পূর্ব ও পশ্চিম দিকে প্রসারিত হইয়াছে। মহাদেশের এই মধ্য-পর্বতমালার একটি হইল **হিমালয়**। উহা পামীর মালভূমি হইতে পূর্বদিকে সম্প্রসারণকালে ভারতের উত্তর ভাগ গঠন করিয়াছে। হিমালয় পর্বতমালা তিনটি বিশেষ পর্বতশ্রেণীর সমন্বয়ে গঠিত। ঐ তিনটি পর্বতশ্রেণী পরস্পর সমান্তরালভাবে পশ্চিম হইতে পূর্বদিকে বিস্তৃত। দুই পর্বতশ্রেণীর মধ্যবর্তী পার্বত্য উপত্যকা ও মালভূমি জনহিতকর কার্যে সমৃদ্ধ। তিনটি পর্বতশ্রেণীর মধ্যে সর্বদক্ষিণের শ্রেণীটি দৈর্ঘ্যে ক্ষুদ্রতম ও উচ্চতায় নিম্নতম। উহার উচ্চতা ৬০০ মিটার হইতে ১৫০০ মিটার পর্যন্ত। সর্বদক্ষিণের এই শ্রেণীটিকে **বহির্হিমালয়** (Outer Himalayas) বা **শিবালিক** পর্বতশ্রেণী বলা হয়। এই পর্বতশ্রেণী ভেদ করিয়া **গঙ্গানদী** উত্তর প্রদেশের **হরিদ্বারের** নিকট মধ্যসমভূমিতে অবতরণ করিয়াছে। বহির্হিমালয় পর্বতমালার ঠিক উত্তরভাগে বিস্তীর্ণ উপত্যকা, ইহার পশ্চিম অংশকে **ডুন উপত্যকা** এবং পূর্ব ভাগকে **মারী উপত্যকা** বলা হয়। ডুন উপত্যকায় বহু লোক বাস করে এবং তথায় নানা ধরনের মনুষ্যহিতকর কার্যের সংস্থা বিদ্যমান। ডুন উপত্যকার **দেরাডুন** শহরের নাম সকলের পরিচিত।

হিমালয় পর্বতমালার মধ্যের শ্রেণীটির নাম **অন্তর্হিমালয়** বা **মধ্যহিমালয়**। অন্তর্হিমালয় পর্বতশ্রেণীর উচ্চতা ১৮৩০—৪৫০০ মিটার।

অন্তর্হিমালয় পর্বতমালার কয়েকটি শৈলাবাস **মুসৌরী, ল্যান্সডাউন, পাহাড়পুর, চাম্বা, উধামপুর** ও **জম্মু** বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই সকল শৈলাবাসে গ্রীষ্মকালে বায়ু-পরিবর্তনের জন্য বহু পর্যটকের সমাগম হয়। কাশ্মীরের সুদৃশ্য বিস্তীর্ণ **কাশ্মীর উপত্যকা** ও **উলার হ্রদ** এই অঞ্চলে অবস্থিত। জম্মু হইতে শ্রীনগরের পথে **পীরপাঞ্জাল** নামক পর্বতটি মধ্যহিমালয় পর্বতশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত।

গঙ্গার উৎসের পূর্বভাগে হিমালয় পর্বতমালায় মধ্যহিমালয় নামক পর্বতশ্রেণীটি অনেক স্থানে দেখা যায় না। সেখানে বহির্হিমালয় পর্বতশ্রেণীটির উত্তরে হিমালয়ের সর্ব উত্তরের পর্বতশ্রেণী বিদ্যমান।
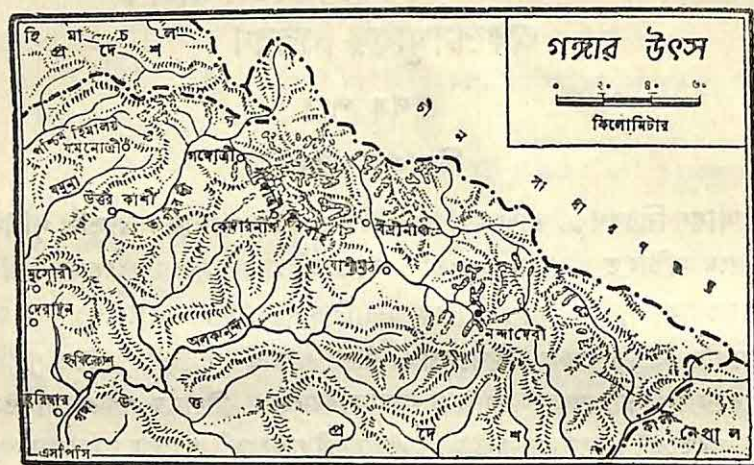
অন্তর্হিমালয় পর্বতশ্রেণীর উত্তরে হিমালয় পর্বতমালার সর্ব উত্তরের পর্বতশ্রেণীটি পশ্চিম হইতে পূর্বদিকে প্রসারিত। ইহা **উচ্চ হিমালয়** বা **হিমাদ্রি** (Great Himalayas) নামে অভিহিত। ইহার উচ্চতা সর্বাপেক্ষা অধিক এবং অনেক স্থানেই ইহা চিরতুষারাবৃত। এই পর্বতশ্রেণীটির উচ্চতা পূর্বদিক হইতে পশ্চিম দিকে ক্রমশঃ হ্রাস পাইয়াছে। ইহার গড় উচ্চতা ৬০০০ মিটারের উর্ধ্বে। উচ্চ হিমালয়ের **কারাকোরাম পর্বত** পামীর মালভূমি হইতে পূর্বদিকে সম্প্রসারিত। ইহার দক্ষিণ-পূর্বদিকে **কৈলাসপর্বত** তিব্বতী চীনের অংশমাত্র। কৈলাস পর্বত ও উচ্চ হিমালয়ের মধ্যস্থিত তিব্বতীয় মালভূমির বক্ষে **মানস সরোবর** হিন্দুদিগের তীর্থস্থান। এই সরোবরের অনতিদূরে **সিন্ধু ও ব্রহ্মপুত্র** (সাংপু) নদদ্বয় উৎপত্তিলাভ করিয়াছে। উভয় নদ একে অন্যের বিপরীত দিকে হিমালয় পর্বতশ্রেণীর সমান্তরাল থাকিয়া প্রবাহিত হইয়াছে। সিন্ধুনদের উপনদী **শতদ্রুও** এই স্থানে উৎপত্তিলাভ করিয়াছে। উচ্চ হিমালয় (Great Himalayas) পর্বতশ্রেণীটি পশ্চিমদিকে কাশ্মীর রাজ্যের **নাঙ্গাপর্বত** হইতে পূর্বদিকে অরুণাচল রাজ্যের **নামচা বাড়ওয়া পর্বত** (৭৬৩৪ মিটার) পর্যন্ত বিস্তৃত। জম্মু-কাশ্মীর রাজ্যের **জাস্কর পর্বত** এই শ্রেণীর অন্তর্গত। পশ্চিমদিকে নাঙ্গাপর্বতকে বেষ্টন করিয়া **সিন্ধুনদ** পাকিস্তানে এবং পূর্বদিকে নামচা বাড়ওয়াকে বেষ্টন করিয়া সাংপু

নদী দিহাং বা সিয়াং নামে অরুণাচল রাজ্যে প্রবেশ করিয়া তথা হইতে **ব্রহ্মপুত্র নদ** নামে আসামে প্রবেশ করিয়াছে।

উচ্চ হিমালয় পর্বতশ্রেণীতে ভারতের তথা পৃথিবীর সর্বোচ্চ গিরিশৃঙ্গগুলি অবস্থিত। ইহাদের মধ্যে **চৌখাম্বা, গোঁসাইথান, চমোলহরি, নন্দাদেবী, কামেত, বদ্রীনাথ, গৌরীশঙ্কর, ধবলগিরি, কাঞ্চনজঙ্ঘা** ও **এভারেষ্ট** শৃঙ্গগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। **এভারেষ্ট** পৃথিবীর সর্বোচ্চ পর্বতশৃঙ্গ।

হিমালয় পর্বতমালার পূর্বভাগে অনেক স্থানে বহির্হিমালয় পর্বতশ্রেণীর উত্তরে উচ্চ হিমালয় পর্বতশ্রেণীটি দেখা যায়। সেখানে এই দুই পর্বতশ্রেণীর মধ্যে অবস্থিত **নেপালের উপত্যকা** বিস্তৃত স্থান অধিকার করিয়া আছে। আরও পূর্বদিকে ভারতের অঙ্গরাজ্য **সিকিম** ও প্রতিবেশী পার্বত্য রাজ্য **ভুটান** বিদ্যমান। পূর্বের প্রান্তভাগে ভারতের নবগঠিত **অরুণাচল** রাজ্যটি বিদ্যমান।

হিমালয় পর্বতমালার উত্তর-পশ্চিমাংশে **লাডাক, জাস্কর, পীরপাঞ্জাল** ও **পাঙ্গি** নামক পর্বতশ্রেণীগুলি পরস্পর সমান্তরাল থাকিয়া দক্ষিণদিকে বাঁকিয়াছে। ইহাদের মধ্যে পীরপাঞ্জাল পর্বতটির গড় উচ্চতা প্রায় ৩৫৯০ মিটার। **বানিহাল গিরিপথের** নিকট এই পাহাড়ের ভিতর দিয়া সম্প্রতি **জওহর টানেল** নামক সুড়ঙ্গ খনন করায় জম্মু ও কাশ্মীর উপত্যকাদ্বয়ের মধ্যে সংযোগ স্থাপিত হইয়াছে। পৃথিবীর সুদীর্ঘ সুড়ঙ্গগুলির মধ্যে ইহা অন্যতম। বর্তমানে এই সুড়ঙ্গপথে সারা বৎসর জম্মু-কাশ্মীরের নিকটবর্তী ভারতের অন্যান্য রাজ্যসমূহ হইতে যাত্রী, পর্যটক ও পর্বতারোহীরা জম্মু-কাশ্মীরে যাতায়াত করে। এই পথে পণ্যদ্রব্য পরিবহন করাও অনেক সহজ হইয়াছে। সুড়ঙ্গটি **উরি-জম্মু-শ্রীনগর** জাতীয়সড়কের উপর অবস্থিত।

পাঞ্জাবের কুলু উপত্যকা হইতে মানালি পার হইয়া **রোটাং** এবং **বরলাচা** গিরিপথে সিন্ধু উপত্যকার **লেহ্** নগরে যাওয়া যায়। **সিমলা** হইতে **সিপ্‌কি** গিরিপথে পূর্বে তিব্বতের সহিত স্থলপথে ব্যবসা হইত। লেহ্ নগর হইতে কারাকোরাম পর্বত পার হইয়া **সাসার** গিরিপথে **ইয়ারখন্দ** পৌছান যায়। **শ্রীনগর** হইতে **জোজিলা** গিরিপথে তুর্কিস্তানে যাওয়া যায়।

হিমালয় পর্বতমালার পূর্ব প্রান্তে উত্তর-দক্ষিণে প্রসারিত উত্তরপূর্ব-সীমান্ত পর্বতমালা ও উহার দক্ষিণে পূর্ব-পশ্চিমে প্রসারিত পূর্বসীমান্ত পর্বতমালা বিদ্যমান। এই পর্বতশিরা দুইটি **আসাম বা মেঘালয় পর্বতশ্রেণী** নামে পরিচিত। **পাটকই, নাগা, লুসাই, বরাইল, খাসিয়া, জয়ন্তিয়া** ও **গারো** প্রভৃতি পাহাড় এই পর্বতমালার অন্তর্গত। এই পর্বতগুলির মধ্যে উপত্যকা ও মালভূমি বিদ্যমান। **আসাম** বা **ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা, শিলং মালভূমি** ও **মণিপুর মালভূমি** ইহাদের

মধ্যে উল্লেখযোগ্য। এইখানকার জলবায়ু **আর্দ্র** অথচ **মহাদেশীয়**। সারা বৎসর অঞ্চলটি মেঘে ঢাকা থাকে। এইজন্য এই পার্বত্য অঞ্চলটিকে **মেঘালয়** বলা চলে। অত্যধিক আর্দ্রতার জন্য এখানে গহন বনভূমির সৃষ্টি হইয়াছে। অনেক স্থানে ভূমির উচ্চতা অনুযায়ী **চিরহরিৎ, পর্ণমোচী** ও **সরলবর্গীয়** বৃক্ষরাজি দৃষ্ট হয়। **নাগাল্যাণ্ড, মণিপুর, মেঘালয়, মিজোরাম, ত্রিপুরা** এবং **অরুণাচল** এই ছয়টি পার্বত্য রাজ্য এই পার্বত্য অঞ্চলে অবস্থিত।

হিমালয় অঞ্চলের ভূ-প্রকৃতিগত কতকগুলি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য রহিয়াছে। এই অঞ্চলের উচ্চ পর্বতগাত্র সারা বৎসর বরফস্তূপে আবৃত থাকে। হিমরেখার নীচে আসিলেই নিম্নাংশের বরফস্তূপ সমূহ গলিতে আরম্ভ করে এবং হিমবাহের সৃষ্টি হয়। হিমবাহে বরফস্তূপগুলি ধীরে ধীরে নীচের দিকে নামিতে থাকে এবং ক্রমশঃ গলিয়া উহার জলধারা নদী ও জলপ্রপাতের সৃষ্টি করে। হিমবাহ হইতে প্রবাহিত নদীগুলি ইহাদের ক্ষয়কার্যের দ্বারা V অক্ষরের আকৃতিবিশিষ্ট গভীর **গিরিখাত** সৃষ্টি করিয়াছে। স্থানে স্থানে কঠিন ও নরম শিলার ভিন্নরূপ অবক্ষয়ের জন্য নদীপথে জলপ্রপাত ও নির্ঝর প্রভৃতি দেখা যায়। হিমবাহ-সৃষ্ট উপত্যকাগুলি ইংরেজী U অক্ষরের ন্যায়। উহাদের দুই পার্শ্বে উপরের দিকে **ক্ষুদ্র ঝুলন্ত উপত্যকা** দেখা যায়। হিমালয়ের হিমবাহগুলির মধ্যে জেমু, কেদারনাথ, কাঞ্চনজঙ্ঘা, গঙ্গোত্রী ও যমুনোত্রী প্রভৃতি প্রধান। তুষারপাত সহ হিমবাহের জন্য এবং প্রচুর বৃষ্টিপাতের ফলে হিমালয় হইতে প্রবাহিত নদীগুলিতে সারা বৎসর জল থাকে। এই অঞ্চলের সবগুলি নদীই বরফগলা জলে পুষ্ট।

প্রাকৃতিক অবস্থা বিচারে সমগ্র হিমালয় পর্বতমালা একই ভৌগোলিক অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত নহে। ভারতে ইহা দুইটি বিশেষ ভৌগোলিক অঞ্চলে বিভক্ত– **(খ) পশ্চিম হিমালয়** ও **(২) পূর্ব হিমালয়**। পশ্চিম হিমালয় ও পূর্ব হিমালয়ের মধ্যস্থলে **গঙ্গার উৎস** বিরাজমান। এক্ষণে পর্যায়ক্রমে এই দুই অঞ্চলের প্রাকৃতিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থার আলোচনা করা হইল। কাহারও কাহারও মতে নেপাল হিমালয় মধ্য হিমালয় নামে পরিচিত। আঞ্চলিক সাদৃশ্য ও সামঞ্জস্য অনেকটা অনুরূপ থাকায় এই পুস্তকে নেপাল হিমালয় পূর্ব হিমালয়ের অংশ বলিয়া পরিগণিত হইল।

(১) পশ্চিম হিমালয়

প্রাকৃতিক পরিবেশ–

অবস্থান ও ভু-প্রকৃতি : গঙ্গা উৎসের পশ্চিমে অবস্থিত পশ্চিম হিমালয় পর্বতমালাটি ভারত যুক্তরাষ্ট্রের সমগ্র **হিমাচল প্রদেশ** ও **জম্মু-কাশ্মীর** রাজ্যদ্বয়

এবং **পাঞ্জাব** রাজ্যের উত্তরাংশ লইয়া গঠিত। অঞ্চলটি ভারতের উত্তর-পশ্চিমে ৩২°১০´ উঃ—৩৮°৮´ উঃ অক্ষাংশের এবং ৭১°১০ পূঃ – ৭৮ পূঃ দ্রাঘিমাংশের মধ্যে অবস্থিত।

এই অঞ্চলের **কারাকোরাম পর্বত, লাডাখ পর্বত জাস্কর পর্বত, পীরপাঞ্জাল পর্বত ও সিওয়ালিক** বা **শিবালিক পর্বতশ্রেণী** প্রায় সমান্তরাল ভাবে অবস্থিত। পর্বতশ্রেণীগুলির মধ্যে মধ্যে উপত্যকা বিদ্যমান। উপত্যকার উপর দিয়া স্থানে স্থানে নদী প্রবাহিত। আঞ্চলিক উপত্যকা বলিতে **কাংড়া, কুলু, জম্মু, কাশ্মীর ও ছাম্ব** প্রধান। নদীর মধ্যে **সিন্ধু নদ** ও উহার পাঁচটি উপনদী **চন্দ্রভাগা, বিতস্তা** (ঝেলাম), **শতদ্রু, বিপাশা ও ইরাবতী** উল্লেখযোগ্য।

জলবায়ু: পশ্চিম হিমালয় অঞ্চলের জলবায়ু **পার্বত্য**। অনেক স্থানে সময় সময় তাপ দ্রবণাঙ্কের অনেক নিম্নে থাকে। শীতকালে প্রায়ই তুষারপাত হয়।

গ্রীষ্মকালে বৃষ্টিপাত সামান্য হয়। শীতকালে মাঝে মাঝে মধ্য অক্ষাংশের ঘূর্ণিবাতে এখানে বারিপাত হয়। পূর্ব হিমালয় হইতে পশ্চিম হিমালয় ভূবিষুবরেখা হইতে অপেক্ষাকৃত দূরবর্তী হওয়ায় বার্ষিক গড় তাপমাত্রা পূর্ব হিমালয় অপেক্ষা পশ্চিম হিমালয়ে কম। কিন্তু মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে পূর্ব হিমালয়ে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ পশ্চিম হিমালয় অপেক্ষা বেশী। উভয় অঞ্চলের বৃষ্টিপাত ও তাপমাত্রার এইরূপ পার্থক্যের ফলে পূর্ব হিমালয়ের জলবায়ু সাধারণতঃ উষ্ণ ও আর্দ্র, কিন্তু পশ্চিম হিমালয়ের জলবায়ু শুষ্ক ও শীতল। উচ্চ হিমালয় মৌসুমী বায়ু-প্রবাহে বাধার সৃষ্টি করে বলিয়া ইহার উত্তরভাগে অঞ্চলসমূহে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ খুবই কম। ফলে লাডাখ, লাহুল প্রভৃতি অঞ্চল স্বাভাবিক উদ্ভিজ্জবিহীন শুষ্ক মরুভূমির ন্যায়।

এই অঞ্চলে পার্বত্য জলবায়ু বিরাজমান থাকিলেও উচ্চতার তারতম্য অনুসারে স্থানভেদে শীত-গ্রীষ্মের তারতম্য হয়।

সমগ্র কাশ্মীর উপত্যকার জলবায়ু সাধারণভাবে স্বাস্থ্যকর ও অতি মনোরম। এখানে গড় বার্ষিক বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ৬৫ সে.মি.। গ্রীষ্মকালে বৃষ্টিপাত কম, শীতকালে পশ্চিমা বায়ুপ্রবাহে বৃষ্টিপাত বেশী হয়। শীতকালে কোন কোন স্থানে তাপমাত্রা -২০° সে. এ নামিয়া যায়, কিন্তু গ্রীষ্মকালে ৩৮° সে. এর বেশী হয় না, গড় তাপমাত্রার পরিমাণ ২৩° সে.। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের জন্য কাশ্মীর উপত্যকার খ্যাতি আছে। **ডাল, উলার** প্রভৃতি হ্রদ এই উপত্যকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য বৃদ্ধিতে বিশেষ অবদান যোগাইয়াছে। গ্রীষ্মকালের মে-জুন মাস হইতে আরম্ভ করিয়া অক্টোবর মাসে শীতের আগমনের পূর্ব পর্যন্ত সমগ্র উপত্যকা ফলে-ফুলে মনোরম হইয়া উঠে। নানারূপ বর্ণবাহারী ফুল ও প্রকৃতির নয়নমনোহর সবুজের সমারোহ দর্শকদের নিকট বিশেষ আকর্ষণীয়। তাই এই সময় দেশ-বিদেশ হইতে এই উপত্যকার বিভিন্ন কেন্দ্রে, বিশেষতঃ জম্মু কাশ্মীরের রাজধানী **শ্রীনগরে** অসংখ্য ভ্রমণকারীর সমাবেশ ঘটে। ডালহ্রদে ভাসমান প্রমোদতরী (শিকারা)-গুলিতে অনেক ভ্রমণকারী বাস করেন। উপত্যকার অধিবাসীদের এই সময় অতিরিক্ত উপার্জনের সুযোগ ঘটে। স্থানীয় কুটীরশিল্পজাত জিনিসপত্রেরও চাহিদা বাড়িয়া যায়।

হিমাচলের কাংড়া ও কুলু উপত্যকার জলবায়ুও মনোরম। কুলু উপত্যকার **মানালী** একটি বিখ্যাত ভ্রমণকেন্দ্রে পরিণত হইয়াছে। **সিমলা, ডালহৌসী, ধরমশালা** প্রভৃতি খ্যাতনামা শৈলাবাস।

উদ্ভিদ ঃ অঞ্চলটির পর্বতগাত্র উচ্চতা অনুযায়ী নানাজাতীয় বৃক্ষে ঢাকা। সাধারণতঃ পাইন, ফার, বার্চ প্রভৃতি **পর্ণমোচী** ও **সরলবর্গীয়** বৃক্ষই অধিক।

বনভূমির প্রত্যক্ষ দান যথেষ্ট। **আসবাবপত্রের কাঠ, জ্বালানী কাঠ, গঁদ ও রজন** বনভূমি হইতে সংগৃহীত হয়।

জীবজন্তু : পশ্চিম হিমালয়ে হিংস্র পশু কম। প্রধানতঃ মেষ, হরিণ ও চমরী-গাই এই অঞ্চলের বনে দেখা যায়।

খনিজ সম্পদ : এই অঞ্চলে কিয়ৎপরিমাণ **কয়লা, খনিজ লৌহ, তাম্র, কেওলীন** (মিহি চীনামাটি) ও **শ্লেট প্রস্তর** প্রভৃতি পাওয়া যায়।

অর্থ নৈতিক ও সামাজিক পরিবেশ –

অধিবাসী : পশ্চিম-হিমালয় অঞ্চলের অধিবাসীরা প্রধানতঃ কাশ্মীরী, পাঞ্জাবী, শিখ, গাড়োয়ালী ও পাহাড়িয়া প্রভৃতি। এই অঞ্চলের জনসংখ্যা প্রায় ১·৩ কোটি। উহাদের মধ্যে অনেকেই সুশ্রী, গৌরবর্ণ, দীর্ঘকায় ও বলিষ্ঠ। অধিবাসীদের অনেকেই কর্মঠ ও কষ্টসহিষ্ণু। কৃষিকার্যে ও কুটিরশিল্পে উহারা নিপুণ। গ্রামবাসীদের অধিকাংশ কৃষিজীবী। পশুপালন করিয়াও অনেকে জীবিকা নির্বাহ করে। এই অঞ্চলের অধিবাসীদের প্রধান খাদ্য রুটি ও মাংস। ইহা ছাড়া উহারা ভাত, ডাল ও দুগ্ধ ইত্যাদি খায়। অধিবাসীদের মধ্যে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী লোক আছে। কাশ্মীর উপত্যকায় মুসলমান ধর্মাবলম্বীর সংখ্যা অধিক। জম্মু উপত্যকায় হিন্দু অধিক। হিমাচলে হিন্দু, লাডাখে বৌদ্ধ এবং পাঞ্জাবে শিখ অধিক। **জম্মু ও কাশ্মীরের** অধিবাসীরা কাশ্মীরী, ডোগরী ও উর্দু ভাষায় কথা বলে। **হিমাচল রাজ্যের** অধিবাসীদের মধ্যে পাহাড়ী ও হিন্দি ভাষা প্রচলিত। পাঞ্জাবীদের ভাষা পাঞ্জাবী। **জম্মু, কাশ্মীর ও হিমাচলের** পুরুষ ও নারীরা প্রায় একই প্রকার পোষাক পরিধান করে। পুরুষদের অনেকেই মাথায় টুপি ব্যবহার করে। হিমাচলের অধিবাসীরা উৎসবের সময় চাকচিক্যময় পোষাক ও পাগড়ী পরিধান করে। পশ্চিম হিমালয় অঞ্চলের অধিবাসীদের অনেকেই সৈন্যবিভাগে কাজ করে। সৈন্যবিভাগে ইহাদের কৃতিত্ব প্রশংসনীয়।

জলসেচ ও বিদ্যুৎ : জম্মু-কাশ্মীর রাজ্যে **কাথুয়া খাল** ও **প্রতাপ খাল** দিয়া জলসেচকার্য আরম্ভ হইয়াছে। উভয় খালের জলে কমপক্ষে ১৭ হাজার হেক্টার কৃষি জমিতে জলসেচ হয়। **তাওয়াই জলসেচ প্রকল্পে** অতিরিক্ত প্রায় ১৪ হাজার হেক্টার কৃষি জমি জলসেচের অন্তর্ভুক্ত হইবে। অঞ্চলটির হিমাচল রাজ্যে জলসেচ-পরিকল্পনা অত্যাবশ্যক নহে। সেখানকার আবাদী জমিতে জলের অভাব নাই।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, পশ্চিম হিমালয় অঞ্চলে অবস্থিত রাজ্যগুলির

বিদ্যুৎ উৎপাদন-ক্ষমতা বর্ধিত হইলে জনহিতকর কার্যে অধিকতর সুবিধা হইবে। এই বিষয়ে পাঞ্জাব রাজ্যের **ভাকরা-নাঙ্গাল পরিকল্পনা** বিশেষ উল্লেখযোগ্য। পশ্চিম হিমালয় অঞ্চলে স্থানীয় কৃষিকার্যে জলসেচের প্রয়োজন না থাকায়, এই পরিকল্পনায় জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের ফলে এই অঞ্চলের বিশেষ উপকার হইয়াছে। এখানকার ৬০০ মেগাওয়াট জলবিদ্যুৎ উৎপাদনক্ষমতা ক্রমশঃ বৃদ্ধি করিয়া ৯০০ মেগাওয়াট করা যাইবে।

জম্মু-কাশ্মীর রাজ্যের **কালকোট তাপবিদ্যুৎ পরিকল্পনা** ও **চেনানী জলবিদ্যুৎ প্রকল্প, উচ্চ সিন্ধু পরিকল্পনা** ও **নিম্ন বিতস্তা পরিকল্পনা** এই অঞ্চলটির বিদ্যুৎ উৎপাদনের বিশেষ ব্যবস্থার পরিচয় দেয়। **বারমূলায়** একটি বিদ্যুৎ উৎপাদনকেন্দ্র আছে। জম্মু-কাশ্মীর উপত্যকায় ৬০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদিত হইবার কথা।

হিমাচল রাজ্যে জলবিদ্যুৎ পরিকল্পনাগুলির মধ্যে শিরমূর জিলায় **গিরি পরিকল্পনা**, মান্দী জিলায় **উল পরিকল্পনা**, চাম্ব জিলায় **বৈরা সিউল পরিকল্পনা**, বিলাসপুর জিলায় **কোলবাঁধ পরিকল্পনা** এবং কুলু জিলায় **পার্বতী উপত্যকা জলবিদ্যুৎ পরিকল্পনা** বিশেষ উল্লেখযোগ্য। মোট কথা, আজিকার মানুষ বন্ধুর পর্বতমালা দ্বারা বেষ্টিত উপত্যকাগুলিকে বিদ্যুতের সাহায্যে আলোকিত করিতে ও সেই স্থানের প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহার করিয়া শিল্প প্রসারে যত্নশীল।

কৃষি ও পশুপালন: জলসেচ পরিকল্পনা কৃষি উন্নয়নে যথেষ্ট সাহায্য করে। স্থানীয় তাপমাত্রা ও বারিপাত কৃষিকার্যের উপযোগী। এই অঞ্চলের দক্ষিণভাগে তাপমাত্রা কিছুটা বেশী এবং বারিপাত অধিক। এইখানে পর্বতগাত্রের ধাপে ধাপে ও উপত্যকায় **ধান** ও **আলুর** চাষ হয়। পাঞ্জাবের কাঙড়া উপত্যকায় **চা** উৎপন্ন হয়। কাশ্মীর উপত্যকার দক্ষিণে জম্মু উপত্যকা হইতে কুলু ও কাঙড়া উপত্যকা পর্যন্ত ভূভাগে **ধান, গম, যব,, ভুট্টা, জোয়ার, তামাক** ও **তৈলবীজ** উৎপন্ন হয়। পাঞ্জাবে ও কাশ্মীরে **আঙ্গুর, বেদানা, কমলালেবু** ও **আপেলের** উপবন রহিয়াছে। ইহা ছাড়া এই অঞ্চলে **আখরোট, খুবানী, পীচ** ও **প্লাম** প্রভৃতি সুমিষ্ট ফল যথেষ্ট উৎপন্ন হয়। কাশ্মীর উপত্যকায় **তুঁত** চাষ অগ্রগতির পথে চালিত।

গৃহপালিত গবাদি পশু বলিতে মেষ ও ছাগল প্রধান। মাংস, দুগ্ধ, পনীর ও চামড়া বিশেষ পশুজাত পণ্যসামগ্রী।

এই অঞ্চলের অধিবাসীদের অন্যতম প্রধান উপজীবিকা পশুপালন। কাশ্মীর উপত্যকার গুর্জর এবং কুলু উপত্যকার গড্ডী উপজাতীয়রা পশুপালন করিয়া জীবিকা-নির্বাহ করে। এই অঞ্চলে কৃষিযোগ্য জমির পরিমাণ কম থাকায় এবং কৃষিজ ফসল

উৎপাদন অত্যন্ত শ্রমসাধ্য বলিয়া অধিবাসীরা পশুপালন জীবিকা হিসাবে গ্রহণ করিয়াছে। পর্বতের ঢালে কাষ্ঠনির্মিত গৃহে ইহারা বাস করে। গ্রীষ্মকালে পাহাড়ের উচ্চ সীমায় ইহারা পশুপাল লইয়া যাত্রা করে এবং শীতকালে আবার পশুপাল লইয়া নীচের উপত্যকায় নামিয়া আসে। উভয় স্থানেই ইহাদের আবাস থাকে। এইভাবে ইহারা অনেকটা যাযাবর পশুপালকের জীবন যাপন করে।

শ্রমশিল্প ঃ অঞ্চলটির নিজস্ব শিল্প বলিতে **রেশমশিল্প, পশমশিল্প ও কাঠ-খোদাই** প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ শিল্পকে বুঝায়। **কাশ্মীরীশাল ও হিমাচলপ্রদেশের কার্পেট** জগদ্বিখ্যাত। বর্তমানে এই অঞ্চলে বিশেষতঃ কাশ্মীরের শ্রীনগরে কয়েকটি শিল্পপ্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইয়াছে। এইগুলি রাজ্যসরকারের সংস্থা, **জম্মু-কাশ্মীর মিনারেলস্ লিমিটেড** এবং **জে. এণ্ড. কে. ইণ্ডাস্ট্রিজ্ লিঃ** নামে অভিহিত। উহাদের ১৮টি কারখানায় **কাপড়, তারপিন তৈল, রজন, রেশমবস্ত্র, পশমবস্ত্র, দিয়াশলাই, সিমেন্ট** প্রভৃতি সামগ্রী প্রস্তুত হয়। সম্প্রতি **হিন্দুস্থান মেসিন টুলস্ লিঃ**এর ঘড়ির কারখানা ও **ইণ্ডিয়ান টেলিফোন ইণ্ডাস্ট্রিজ্ লিঃ** সংস্থার টেলিফোনের যন্ত্রপাতির কারখানা স্থাপিত হইয়াছে। পরিবহণে প্রাকৃতিক অন্তরায় ও প্রতিকূল অবস্থা ভারী শিল্পসংস্থা গঠনে ততটা উৎসাহ দেয় না। এই কারণে অঞ্চলটিতে লোকসংখ্যার ঘনত্ব অল্প এবং প্রাকৃতিক সম্পদ আহরণ সামান্য। প্রতিকূল পরিবেশ বহুদিন যাবৎ অঞ্চলটিতে আর্থিক উন্নয়ন স্থিতিশীল রাখে। বর্তমানে বিভিন্ন নদী-প্রকল্প জলবিদ্যুৎ উৎপাদনে সাহায্য করায় এবং স্থানে স্থানে আধুনিক পরিবহণ কার্যকর হওয়ায় শিল্প-কারখানা স্থাপনে কিছুটা সুযোগ হইতেছে।

পরিবহণ ও বাণিজ্য ঃ এই ভৌগোলিক অঞ্চলে রেলপথ নাই ; রাজপথে মটরগাড়ীযোগে সমভূমিতে ও পার্বত্য পথে লোকজন যাতায়াত করে ও দ্রব্য-সামগ্রী পরিবহণ করা হয়। বিমানপথে আরোহী ও দ্রব্যসামগ্রী এখান হইতে ভারতের অন্যান্য অঞ্চলে পরিবহণ করা হয়।

পণ্যদ্রব্য বলিতে পশমী শাল, কম্বল, কার্পেট, খোদাই কাঠ, খাদ্যশস্য ও ফল এই অঞ্চল হইতে **রপ্তানি** করা হয় এবং বিনিময়ে খাদ্যসামগ্রী, রসায়নদ্রব্য, যন্ত্রপাতি, যানবাহন ও ঔষধপত্রাদি এই অঞ্চলে **আমদানি** করা হয়। স্থানীয় শিল্পোন্নয়ন ও আধুনিক পরিবহণব্যবস্থা পশ্চিম হিমালয়ে ভোগ্য সামগ্রীর আদান-প্রদান বৃদ্ধি করিতেছে। কালক্রমে অঞ্চলটির অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি হইলে, অধিবাসীদের জীবনযাত্রা সুখময় হইবে।

প্রসিদ্ধ স্থান ঃ শ্রীনগর—জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যের রাজধানী। উহা বিতস্তা নদীর তীরে উলার হ্রদের নিকট মনোরম উপত্যকায় অবস্থিত। এখানে একটি

বিশ্ববিদ্যালয় আছে। **লেহ্**—প্রধান নগর ও বাণিজ্যকেন্দ্র। **গিলগিট**—এই অঞ্চলের উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত বৃহৎ নগর। **উরি, পুঞ্চ্, মীরপুর ও স্কার্দু**—কুটীর-শিল্পের জন্য প্রসিদ্ধ। **কালাদোত ও বরমুলা**—জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যে বিদ্যুৎ উৎপাদনকেন্দ্র। **সিমলা** - হিমাচল প্রদেশের রাজধানী ও স্বাস্থ্যকর স্থান। এখানে একটি বিশ্ববিদ্যালয় আছে। ইহা কেন্দ্রীয় সরকার এবং পাঞ্জাব ও হরিয়ানা সরকারের গ্রীষ্মাবাস। **কসৌলী ও ডালহৌসী**—স্বাস্থ্যকর স্থান। **চম্বা ও মুণ্ডী**—বাণিজ্যকেন্দ্র। **জম্মু**—কাশ্মীর রাজ্যের শীতকালীন রাজধানী। রাজ্যের অনেক সরকারী অফিস শীতকালে এখানে আনা হয়। এই শহরের **'বৈষ্ণবদেবী'** মন্দির দেখিবার জন্য প্রতি বৎসর সহস্র সহস্র লোক ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে এখানে আসে। **অমরনাথ**—হিন্দুদের তীর্থস্থান।

(২) পূর্ব-হিমালয়

প্রাকৃতিক পরিবেশ—

অবস্থান ও ভূ-প্রকৃতি : গঙ্গা উৎসের পূর্বদিক হইতে ভারতের উত্তর-পূর্ব সীমান্ত পর্বতমালা পর্যন্ত পূর্ব হিমালয় প্রসারিত। **উচ্চহিমালয়** (Great
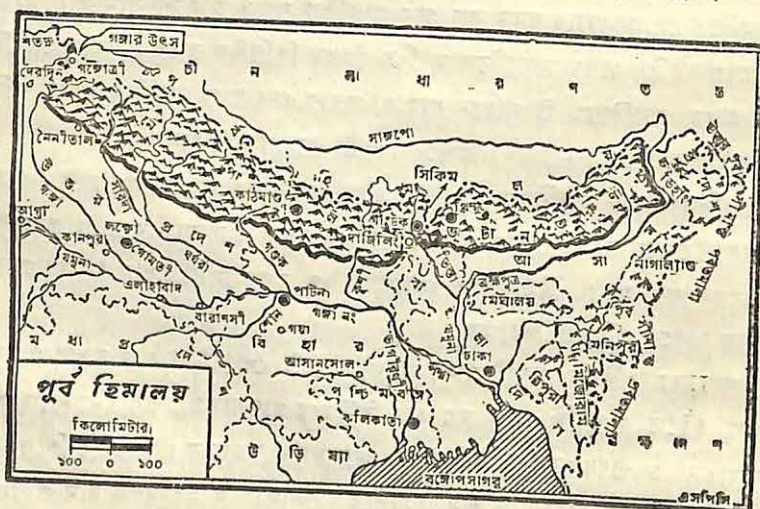
Himalayas), **অন্তর্হিমালয়** (Inner Himalayas) এবং **বহির্হিমালয়** (Outer Himalayas) এই তিন পর্বতশিরা ও উহাদের শাখা-প্রশাখা লইয়া পূর্ব হিমালয় গঠিত। এই তিন পর্বতশিরার মধ্যে মধ্যে **পার্বত্য মালভূমি ও পার্বত্য উপত্যকা** বিরাজমান।

ভারতের এই ভৌগোলিক অঞ্চলটিতে দুইটি স্বাধীন রাষ্ট্র **নেপাল** ও **ভুটান** অবস্থিত। **সিকিম** ভারতের নবীম অঙ্গরাজ্য। সিকিম ও ভুটানের মধ্যবর্তী পূর্ব-হিমালয়ের অংশটুকু চীনের অধিকৃত। সিকিম ও ভুটানের ঠিক দক্ষিণে পূর্ব-হিমালয়ের অংশ লইয়া **পশ্চিমবঙ্গের** পার্বত্য ও উপপার্বত্য অঞ্চল গঠিত। এই অঞ্চলে **দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি** ও **কোচবিহার** জিলাত্রয় বিদ্যমান। পূর্ব-হিমালয় ২৬° ২৫′ উঃ—২৭° উঃ অক্ষাংশ এবং ৭৮° পূঃ—৯৭° ৩০′ পূঃ দ্রাঘিমাংশের মধ্যে অবস্থিত।

পূর্ব-হিমালয়ের উত্তরাংশ বেশ উচ্চ এবং উহাতে বহু পর্বতশৃঙ্গ অবস্থিত। শৃঙ্গগুলির মধ্যে অনেকগুলি চিরতুষারে আবৃত। **এভারেষ্ট, কাঞ্চনজঙ্ঘা, ধবলগিরি** ও **গৌরীশঙ্কর** এই অঞ্চলের উল্লেখযোগ্য পর্বতশৃঙ্গসমূহ। **এভারেষ্ট** পৃথিবীর উচ্চতম পর্বতশৃঙ্গ ; উহার উচ্চতা ৮,৮৪৮ মিটার।

উপত্যকাগুলির মধ্যে **নেপাল উপত্যকা** ও **তিস্তা উপত্যকা** প্রধান। পর্বতশিরায় পশ্চিমবঙ্গের **দার্জিলিং**, সিকিমের **গ্যাংটক**, নেপালের **কাঠমাণ্ডু** ও ভূটানের **পুনাখ** বিশেষ উল্লেখযোগ্য শহর। পূর্ব হিমালয় অঞ্চলটি **রামগঙ্গা, ঘর্ঘরা, গণ্ডক, কুশী, তিস্তা** ও **তোরসা** প্রভৃতি নদী দ্বারা বিধৌত। এই সকল নদী এই অঞ্চলের মধ্য দিয়া উত্তর-দক্ষিণে প্রবাহিত।

জলবায়ু: পূর্ব হিমালয়ের বার্ষিক গড় বারিপাত ২৫৪ সে.মিটারের অধিক। এই অঞ্চলের তাপমাত্রা বেশ নিম্ন। তাপমাত্রা ও বারিপাত জনহিতকর কার্যের অনুকূল বলিয়া সাংস্কৃতিক পরিবেশ সহজেই রচিত হইয়াছে।

উদ্ভিদ্: স্থানীয় পর্বতগাত্র উদ্ভিদে আবৃত। **চিরহরিৎ, পর্ণমোচী, সরলবর্গীয়** ও **আলপীয় বৃক্ষ** এই স্থানের উচ্চতা অনুযায়ী বিশেষ বনভূমি রচনা করিয়াছে। এখানকার **লোহাকাঠ, শাল, আম, কাঁঠাল, বার্চ, পাইন, দেবদারু** ও **ফার** প্রভৃতি বৃক্ষের কাষ্ঠপ্রধান। এখানে স্থানে স্থানে **বাঁশ** ও **বেতের** উপবন রহিয়াছে। **কলা** ও **আনারস** প্রভৃতি ফল প্রাকৃতিক অবস্থায় জন্মে। মানুষের চেষ্টায় ও পরিশ্রমে এখানে **কমলালেবু** ও **আপেলের** উপবন সৃষ্ট হইয়াছে। সমগ্র ভূ ভাগের ৩০ শতাংশে বৃক্ষাদি দৃষ্ট হয়। স্থানে স্থানে ঔষধ প্রস্তুতের উপযুক্ত **ভেষজ গুল্ম** দেখা যায়।

জীবজন্তু: এই ভৌগোলিক অঞ্চলে ব্যাঘ্র, গণ্ডার, মহিষ, হস্তী ও হরিণ প্রভৃতি বন্য এবং গরু, মহিষ, ভেড়া, ছাগল ও ঘোড়া প্রভৃতি গৃহপালিত পশু অনেক দেখা যায়। অনেক সময় **হাতীর দাঁত** ও **মৃগনাভি** পণ্য হিসাবে বাণিজ্যে স্থান পায়। উপত্যকায় নানাজাতীয় **পক্ষী** ও **সর্প** দেখা যায়।

খনিজ সম্পদ ঃ পূর্ব-হিমালয়ে কয়লা, চূণাপাথর, গ্রাফাইট ও অন্যান্য খনিজ সামগ্রী ভূগর্ভে ভিন্ন ভিন্ন গভীরতায় নানা শিলাস্তরে পাওয়া যায়। খনিজ সামগ্রী বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে সন্ধানের জন্য **সিকিম রাজ্যে** 'সিকিম মাইনিং করপোরেশন' নামে এক সংস্থা স্থাপিত হইয়াছে। সংস্থাটি 'জিওলজিক্যাল সার্ভে অব ইণ্ডিয়া' নামক সরকারী সংস্থার সহিত মিলিতভাবে খনিজ সামগ্রী উদ্ধারের চেষ্টা করিতেছে। **ভুটান রাজ্যে** চূণাপাথর ও জিপ্সামের আকর বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়িয়া রহিয়াছে।

অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিবেশ—

অধিবাসী ঃ পূর্ব হিমালয়ে **নেপালী, ভুটিয়া, লেপচা** ও **গুর্খা** প্রভৃতি জাতির বাস। উহাদের মধ্যে অনেকেই **হিন্দু। বৌদ্ধ** ধর্মের প্রভাবও এই অঞ্চলে অতি স্পষ্ট। অধিবাসীরা খর্বাকৃতি, বলিষ্ঠ, কর্মঠ, কষ্টসহিষ্ণু ও সাহসী।

এই স্থানের অধিবাসীদের অনেকেই যুদ্ধকুশলী। স্থানীয় প্রাকৃতিক পরিবেশ উহাদিগকে কষ্টসহিষ্ণু, কর্ম-কুশলী ও সাহসী করিয়াছে। বীরত্বপূর্ণ কার্যে উহারা সকল সময়ই উৎসাহী। এই বিশাল পার্বত্য অঞ্চলে উহারা নিজ শক্তি প্রয়োগে প্রবল প্রতিকূল প্রকৃতিকে বশে আনিয়া আধুনিক প্রণালীতে কৃষি ও শিল্পোদ্যোগের প্রসারে যত্নবান হইয়াছে। স্থানীয় কৃষিকার্যে, শ্রমশিল্পে ও পরিবহণে উহার নিদর্শন পাওয়া যায়।

কৃষি ঃ নদী উপত্যকায়, সমভূমি অঞ্চলে ও পর্বতগাত্রে আধুনিক ধরনে চাষ-আবাদ করিয়া স্থানীয় লোকেরা ধান, ভুট্টা, জোয়ার ও গম উৎপন্ন করে। পূর্বভাগে **সিকিম রাজ্যে** আদা, সয়াবীন, এলাচ ও দারুচিনি প্রচুর উৎপন্ন হয়। দারুচিনি ও এলাচ প্রভৃতি মশলা রপ্তানিতে সিকিম রাজ্য পৃথিবীর মধ্যে সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করে। **সমভূমি অঞ্চলে** আলু ও গম উৎপন্ন হয়। নেপালের দক্ষিণাংশে **তরাই অঞ্চলে** ধান, ভুট্টা, পাট ও তূলা উৎপন্ন হয়। পাট ও তূলা এইখানে শিল্পকারখানা স্থাপনে সহায়তা করিয়াছে। এই স্থানের বনভূমি মূল্যবান বৃক্ষে পরিপূর্ণ। **ভুটান রাজ্যে** ধান, ভুট্টা, জোয়ার, বাজরা ও রাগী (মিলেট, Millet), গম ও যব উৎপন্ন হয়। পশ্চিমবঙ্গের **দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি** ও **কোচবিহার** জিলাগুলি আবাদী চাযে অগ্রণী। এখানকার **চা** ও **ধান** প্রধান ফসল। পূর্ব-হিমালয়ের এই অংশে নানাবিধ **শাক-সব্জী**, কমলালেবু, আনারস ও কলা প্রভৃতি **ফল** উৎপন্ন হয়। পূর্ব-হিমালয়ের পশ্চিমাংশে নিবিড় চাষ প্রথায় আপেলের চাষ হয়।

জলসেচ ও জলবিদ্যুৎ ঃ আঞ্চলিক **কুশী-পরিকল্পনা** দ্বারা নেপাল উপত্যকা বিশেষভাবে উপকৃত হইবে। কুশী-পরিকল্পনা ভারতের এক উল্লেখযোগ্য নদী-

পরিকল্পনা। এই পরিকল্পনায় পূর্ব-হিমালয়ের মধ্যভাগে **ছত্র গিরিখাতে কুশী** নদীবক্ষে বাঁধ নির্মাণের ব্যবস্থা হইয়াছে। সেখানে জল আবদ্ধ করিয়া জলাধার সৃষ্ট হইলে, জলাধারের জল নদীতে প্রবাহিত করাইয়া নদীর বেগ বর্ধিত করা যাইবে। দক্ষিণে উচ্চভূমি ও নিম্নভূমির সঙ্গমস্থলে **হনুমান নগর** নামক স্থানে নদীতে ব্যারেজ নির্মাণক্রমে কাটা খালে জল সরবরাহ করিয়া নেপাল উপত্যকার কৃষি জমিতে জল-সেচ করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। কুশী পরিকল্পনায় ছত্র গিরিখাতে জলবিদ্যুৎ উৎপন্ন হইবে।

অঞ্চলটির পূর্বভাগে **তিস্তা পরিকল্পনায়** পশ্চিমবঙ্গ শুধু জলসেচের সুবিধা পাইবে।

সিকিম ও ভুটান রাজ্যদ্বয়ে জলবিদ্যুৎ উৎপাদন অগ্রগতির পথে। সেখানে ছয়টি কেন্দ্রে জলবিদ্যুৎ উৎপাদন করা হয়। নেপাল রাজ্যেও জলবিদ্যুৎ উৎপাদন করা হয়। নেপাল রাজ্যে নেপাল উপত্যকার দক্ষিণভাগে **বাগমতী** নদীর জলে টারবাইন ঘুরাইয়া বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হয়। এইখানকার বিদ্যুৎ উৎপাদন পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত নেপাল উপত্যকার ও তরাই অঞ্চলের শহরগুলি উৎপন্ন বিদ্যুৎ দ্বারা আলোকিত হয়।

শ্রমশিল্প : পূর্ব-হিমালয়ের উপত্যকা ও সমভূমি অঞ্চলে শিল্প-কারখানা গড়িয়া উঠিয়াছে। উহাদের মধ্যে **নেপালের** তরাই অঞ্চলে পাটকল, কাপড়কল, চিনির কল এবং উপত্যকায় চামড়া, দিয়াশলাই ও জুতার কারখানা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। **সিকিম রাজ্যে** রংপোর চোলাই কারখানা এবং সিংতমে ফল সংরক্ষণ কারখানা বেশ নাম করা। সিকিমে অদূর ভবিষ্যতে ঘড়ি নির্মাণ ও জহরতাদি কাটার কারখানা স্থাপিত হইবে। এই বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকারী সংস্থা হিন্দুস্থান মেসিন টুলস্ লিঃ বিশেষ উৎসাহী।

পূর্ব ও পশ্চিম হিমালয় উভয় অঞ্চলের অধিবাসীরা কারিগরী বিদ্যায় বেশ পারদর্শী। কুটীরশিল্পে হাতেবোনা কাপড়, তুলট কাগজ, কম্বল, কার্পেট, খোদাই কাঠের জিনিস এবং রূপার সামগ্রী প্রভৃতি প্রস্তুত করিতে ইহারা বেশ নিপুণ।

পূর্ব ও পশ্চিম হিমালয় অঞ্চলে **জলবিদ্যুৎ** উৎপাদনের সম্ভাবনা যথেষ্ট। উৎপাদিত জলবিদ্যুৎ শিল্প কারখানা স্থাপনে ও পরিবহণ ব্যবস্থার উন্নয়নে প্রভূত সাহায্য করিবে। কাঁচামালের প্রাচুর্য এবং জলবায়ু অনুকূল থাকায় সংবাদপত্রের কাগজ প্রস্তুত কারখানা, রেশম ও পশম শিল্প, ঘড়ি ও জহরত সামগ্রী প্রস্তুত কারখানা, ফল সংরক্ষণ কারখানা, আধুনিক রসায়ন শিল্প এবং ঔষধ প্রস্তুত কারখানা প্রভৃতি কারখানা স্থাপনের পক্ষে এই অঞ্চল সর্বপ্রকার সম্ভাবনাপূর্ণ বলিয়া বিবেচিত হয়। উন্নত পরিবহণ ব্যবস্থা আঞ্চলিক ব্যবসা-বাণিজ্যের সম্যক প্রসার-কার্যে সাহায্য করিবে।

উন্নত ব্যবসা-বাণিজ্যে দেশের আর্থিক অবস্থা সচ্ছল হইলে অধিবাসীদের জীবনযাত্রার মান অবশ্যই উচ্চ হইবে।

পরিবহণ ও বাণিজ্য ঃ পূর্ব-হিমালয়ে স্থলপথে **গিরিপথ** পণ্যসামগ্রী ও যাত্রী পরিবহণের বিশেষ পথ। এই বিষয়ে কয়েকটি গিরিপথের অবস্থিতি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। দার্জিলিঙ ও কালিম্পং হইতে সিকিমের গ্যাংটক পার হইয়া উত্তরে **জেলেপ্‌লা** ও **নাথুলা** গিরিপথে যাইতে হয়। এই দুই গিরিপথে তিব্বতের **গিয়াঁৎসী** ও **সিগাঁৎসী** যাওয়া যায়। বর্তমানে উভয় গিরিপথে যাতায়াত নিষিদ্ধ।

পূর্ব-হিমালয়ের পশ্চিমভাগে **হরিদ্বার** হইতে **পিপলকোট** হইয়া **নিটি** গিরিপথে **মানস সরোবর** যাইতে হয়। মানস সরোবর **হিন্দুদের তীর্থস্থান**। বর্তমানে ইহা চীনের অধিকারে। উভয় রাষ্ট্রের মধ্যে **নিরোধ আইন** চালু থাকায় সেখানে যাতায়াত ইচ্ছামত হয় না। ভারতের **কাঠগোদাম** হইয়া **আলমোড়া** দিয়া **নিপুলেখ গিরিপথে** অথবা **মানা** গিরিপথে মানস সরোবর যাওয়া যায়।

গিরিপথটি মানস সরোবরে যাতায়াতের পক্ষে সর্বাপেক্ষা নিকটে। যোশীমঠ হইতে **ডমজান নিটি গিরিপথে** ২৮৮ কিলোমিটার হাঁটিলে মানস সরোবরে পৌছান যায়। এই অঞ্চলটির দক্ষিণে ভারতের সুবিস্তৃত **গঙ্গা-সমভূমি**। গঙ্গা-সমভূমি জনহিতকর কার্যে সমৃদ্ধ। পূর্ব-হিমালয় অঞ্চলটি দক্ষিণভাগে নানা রাজপথে গঙ্গা সমভূমির সহিত যোগাযোগ বজায় রাখে। এই প্রসঙ্গে বলা চলে যে, পশ্চিমবঙ্গের **শিলিগুড়ি-দার্জিলিং পথে** পূর্ব-হিমালয়ের পূর্বাঞ্চল যুক্ত। মধ্যভাগে বিহার রাজ্যের চম্পারণ জিলায় **রক্সৌল** রেল স্টেশন হইতে নেপালের ন্যারোগেজ রেলপথটি **বীরগঞ্জ** হইয়া **আমলেখগঞ্জ** পর্যন্ত প্রসারিত। তথা হইতে রাজপথে মোটরবাসে **ভীমপেডি** হইয়া **ত্রিভুবন সড়কে** নেপালের রাজানী **কাঠমাণ্ডু** যাইতে হয়।

পূর্ব-হিমালয়ের পশ্চিমাংশে **হৃষীকেশ** হইতে **ধরাসু** ও **কীর্তিনগর** নামক পার্বত্য শহর দুইটিতে মোটরগাড়ী ও মোটরবাসে যাওয়া যায়। **কোটদ্বার** ও **চামেলির** মধ্যে রাজপথে মোটরগাড়ী যাতায়াত করে। **চামেলি** হইতে মোটর-বাসে **যোশীমঠ** যাইতে হয়। যোশীমঠ হইতে **বদরীনাথ** যাইতে হয়। ধরাসু হইতে গঙ্গার উৎস **গঙ্গোত্রীর** পথে **উত্তরকাশী** পর্যন্ত মোটরগাড়ী রাজপথে চলাফেরা করে। **রুদ্রপ্রয়াগ** হইতে **কেদারনাথের** পথে **গুপ্তকাশী** পর্যন্ত মোটর-গাড়ী যাতায়াত করে।

পূর্ব ও পশ্চিম হিমালয় অঞ্চলে প্রধানতঃ রাজপথে মোটরযানে জিনিসপত্র আমদানি-রপ্তানি হয় ও আরোহী যাতায়াত করে। কোন কোন স্থানে বিদ্যুৎ-

চালিত রজ্জুপথ বা 'রোপওয়েজ' দ্বারা আরোহী ও জিনিসপত্র স্থানান্তরের ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

প্রসিদ্ধ স্থানঃ কাঠমাণ্ডু—নেপাল রাষ্ট্রের রাজধানী। উহা নেপাল উপত্যকায় বাগমতী নদীর তীরে অবস্থিত। **দার্জিলিং**—পশ্চিমবঙ্গের পার্বত্য স্বাস্থ্যাবাস। এখানে বহু পর্যটক স্বাস্থ্য পরিবর্তন করিতে ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দেখিতে যান। এখান হইতে কাঞ্চনজঙ্ঘা শৃঙ্গটি পরিষ্কার দেখা যায়। এইখানকার **টাইগার হিল** নামক পাহাড় হইতে সূর্যোদয় দেখিতে খুব সুন্দর। **থিম্ফু**—ভুটানের আগেকার রাজধানী। **পুণাখা**—ভুটানের প্রসিদ্ধ শহর। **পারো**—ভুটানের বর্তমান রাজধানী। **গ্যাংটক**—সিকিমের রাজধানী।

ভারতের জনজীবনে হিমালয় পর্বতমালার প্রভাবঃ

(১) উত্তর ও উত্তর-পূর্বে অত্যুচ্চ পর্বতমালার হিমবাহ ও তুষার বায়ুমণ্ডলের তাপমাত্রা হ্রাস করায় অঞ্চলটিতে এক **অদৃশ্য উচ্চ বায়ুচাপ বলয়** সর্ব সময় বিদ্যমান। **গ্রীষ্মকালে** অঞ্চলটির দক্ষিণে অবস্থিত ভারতের সমভূমি ও মালভূমির উপর দিয়া জলীয় বাষ্প-সম্পৃক্ত **দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বাতাস** বহে। জলীয় বাষ্পপূর্ণ মৌসুমী বাতাস এইখানকার শীতল বাতাসের সান্নিধ্যে আসিলে বায়ুমণ্ডলে মৌসুমী বাতাসের তাপমাত্রা হ্রাস পায়। ইহার ফলে বর্ষণ শুরু হয়। সেই সময় সোরা ভারতে বারিবর্ষণ হইতে থাকে। **শীতকালে** এই অত্যুচ্চ পর্বতমালার উত্তরে যে **শীতল** অথচ **শুষ্ক বাতাস** বহে, উহা **শীতল বাতাসের স্তম্ভ-স্তর** ভেদ করিতে পারে না; ফলে সারা ভারত তীব্র শীতের হাত হইতে রক্ষা পায়।

(২) পার্বত্য অঞ্চলে হিমবাহ বা তুষার গলা জল হইতে বহু নদীর উৎপত্তি হইয়াছে। বরফ-গলা জল ও স্থানীয় বৃষ্টির জল ঐ সকল নদীতে প্রবাহিত হইলে নদীগুলি জলভারে স্ফীত হয়। ফলে, অনেক সময় নদীতে বন্যা দেখা দেয়। উত্তর ভারতের অধিকাংশ নদীর উৎস এই পার্বত্য অঞ্চলে অবস্থিত বলিয়া ঐ সকল নদী নিত্য প্রবাহিত হইয়া প্রচুর পলিমাটি বহন করে। বাহিত পলিমাটি ভূ-ভাগ রচনা করে। এই পার্বত্য অঞ্চলের তিনটি বৃহৎ নদী—**সিন্ধু, গঙ্গা** ও **ব্রহ্মপুত্র** কর্তৃক মধ্য সমভূমি গঠিত ও উপকৃত। নদী উপত্যকা উর্বর, শ্রীসম্পন্ন, জনবহুল এবং জনহিতকর কার্যে সমৃদ্ধ।

(৩) হিমালয়ের **বনজ সম্পদ** ও **খনিজ সামগ্রী** ভারতের আর্থিক অবস্থা উন্নীত করিতে সহায়তা করে।

(৪) **আঞ্চলিক উচ্চতা** যোগাযোগ ব্যবস্থা দুর্গম করায় কিছুটা অসুবিধা আছে সত্য, কিন্তু অপরদিকে উহা বহিঃশত্রুর অতর্কিত আক্রমণ প্রতিরোধ করে।

(৫) অঞ্চলটি স্বাস্থ্যকর হওয়ায় এবং উহার প্রাকৃতিক দৃশ্য মনোরম থাকায় বিশেষ বিশেষ স্থানে বহু পর্যটকের সমাগম হয়; ফলে অঞ্চলটিতে অর্থাগমের সুযোগ ঘটে। পর্বতমালায় অনেক ঐতিহ্যময় প্রাকৃতিক সৌন্দর্যপূর্ণ ও স্বাস্থ্যকর জায়গা ধর্মস্থানেও পরিণত হইয়াছে।

(৬) পার্বত্য অঞ্চলের অধিবাসীরা নির্ভীক, কর্মঠ, দুঃসাহসিক কার্যে তৎপর ও কষ্টসহিষ্ণু। ইহারা সুস্থ ও সুঠাম দেহবিশিষ্ট। ইহাদের মধ্যে অনেকেই ভারতীয় স্থলবাহিনীতে কৃতিত্ব দেখাইয়াছে। এই অঞ্চলের **গুর্খা, গাড়োয়ালী** ও **ডোগরা** নামে অধিবাসীরা সাধারণতঃ যুদ্ধ-নিপুণ। ইহা ছাড়া ইহাদের **শেরপাগণ** অনেকেই পর্বতারোহণে বেশ পারদর্শী।

(৭) ভঙ্গিল পর্বতমালার শিলাস্তর ভূগঠনে দুর্বল হইয়া পড়ে। উহা ভূমিকম্পের আবাস বলা চলে। সারা বৎসর এই অঞ্চলে লঘু বা তীব্র ধরনের **ভূমিকম্প** হয়।

সমগ্র হিমালয় পর্বতমালায় আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য সুস্পষ্ট। গণ্ডীগুলি ভিন্ন ভিন্ন রাজনৈতিক পরিসীমা লইয়া গঠিত।

গণ্ডী	রাজ্য
(ক) পশ্চিম হিমালয়	১। জম্মু-কাশ্মীর
	২। হিমাচল প্রদেশ
(খ) পূর্ব-হিমালয়	
(১) পশ্চিমাংশে	৩। উত্তর প্রদেশের হালদেওয়ার তহসিল ব্যতীত কুমায়ুন বিভাগ, উত্তর খণ্ড ও দেরাদুন জিলা
(২) পূর্বাংশে	৪। নেপাল রাষ্ট্র
	৫। ভূটান, সিকিম ও পশ্চিমবঙ্গের দার্জিলিং হিমালয়
	৬। অরুণাচল, মেঘালয় ও আসাম রাজ্যত্রয়ের আসাম হিমালয়
	৭। নাগাল্যাণ্ড, মণিপুর ত্রিপুরা রাজ্যত্রয় ও মিজোরামের পূর্বাঞ্চল

অনুশীলনী

১। পশ্চিম হিমালয়ের পর্বত সংস্থান বর্ণনা কর। জলবায়ুর উপর উহাদের প্রভাব বর্ণনা কর।

২। কাশ্মীর উপত্যকার প্রাকৃতিক সম্পদ্ কি? ঐ উপত্যকার জলবায়ু ও মানুষের জীবনযাত্রা বর্ণনা কর।

৩। ভৌগোলিক কারণ দেখাও :—

(ক) লাডাক অঞ্চল মরুপ্রায়। (খ) পশ্চিম হিমালয়ের বহু উপজাতি পশু-পালন করে। (গ) শ্রীনগর একটি উৎকৃষ্ট ভ্রমণকেন্দ্র। (ঘ) কাশ্মীরের প্রায় সব নদীই বরফগলা জলে পুষ্ট।

৪। কুলু বা বিপাশা নদী উপত্যকা কি সম্পদের জন্য বিখ্যাত? কি কারণে বিপাশা উপত্যকায় ঐ সম্পদ্ বেশী উৎপন্ন হয়?

৫। ভাক্রা বাঁধটি কোন্ রাজ্যে এবং কোন্ নদীর গতিপথে নির্মিত হইয়াছে? ঐ রাজ্যের আর কোন্ কোন্ স্থানে জলবিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়? ঐ রাজ্যে জলবিদ্যুতের প্রয়োজন খুব বেশী কেন?

৬। পূর্ব হিমালয়ের জলবায়ু, উদ্ভিদ ও কৃষিকার্য বর্ণনা কর।

৭। পূর্ব হিমালয়ের সর্বাপেক্ষা উন্নত শহরের নাম কর। সংক্ষেপে এই উন্নতির কারণ বর্ণনা কর।

৮। ভৌগোলিক কারণ নির্দেশ কর :—

(ক) পূর্ব হিমালয় জনবিরল। (খ) হিমালয় অঞ্চলে বেশী ভূমিকম্প হয়। (গ) কুমায়ুন অঞ্চলের ভোট জাতির লোকেরা অর্ধ যাযাবর। (ঘ) পার্বত্য গতিতে গঙ্গা নদীতে বহু কাঠের খণ্ড ভাসিতে দেখা যায়। (ঙ) ধূপ ও রজন সংগ্রহ হিমালয় অঞ্চলে বহু লোকের জীবিকা।

৯। কাশ্মীর উপত্যকা কি কি সামগ্রীর জন্য প্রসিদ্ধ?

১০। 'কাশ্মীর উপত্যকায় পশম ও শীতোষ্ণ অঞ্চলের ফল অধিক পাওয়া যায়'—কারণ দেখাও।

১১। হিমালয় অঞ্চলে মানুষের গৃহগুলি সাধারণতঃ কি কি উপকরণ দিয়া প্রস্তুত? গৃহগুলির ছাদ সমতল না হেলান? ইহার কারণ কি?

১২। হিমালয়—পূর্ব ও পশ্চিম—উভয় অঞ্চলে কোন্ কোন্ উপজাতির বাস? উহাদের ভাষা ও পোষাক সম্বন্ধে যাহা জান লিখ।

১৩। পার্বত্য অঞ্চলের ভৌগোলিক পরিবেশ ভারী শিল্প গঠনের প্রতিবন্ধক কেন? আলোচনা করিয়া বুঝাইয়া দাও। (১৯৭৬ মাঃ পঃ)

১৪। চা উৎপাদনে ভারতের কোন্ অঞ্চল প্রসিদ্ধ?

দ্বিতীয় পাঠ

গাঙ্গেয় সমভূমি

সাধারণ বিবরণ : হিমালয় পর্বতমালার দক্ষিণে অবস্থিত উত্তর ভারতের সমভূমিটি **মধ্যের সমভূমি** নামে পরিচিত। উহা নদীবাহিত পলল মৃত্তিকা দ্বারা গঠিত। অঞ্চলটিতে মৃত্তিকার বেধ কয়েক হাজার মিটার গভীর। এই স্থানের মৃত্তিকা স্তরে স্তরে সাজান। তিনটি সুদীর্ঘ নদী—**সিন্ধু, গঙ্গা** ও **ব্রহ্মপুত্র** এবং উহাদের উপনদীগুলি দ্বারা এই সমভূমি বিধৌত।

ভারতের এই সমভূমিটি পাকিস্তানের পশ্চিম পাঞ্জাবের পূর্ব সীমা হইতে আসাম রাজ্যের উত্তর-পূর্ব পর্বতমালা পর্যন্ত বিস্তৃত। সমভূমিটি সমগ্র ভারত রাষ্ট্রের এক-তৃতীয়াংশ ভূ-ভাগ অধিকার করিয়া রহিয়াছে। ইহা পূর্ব-পশ্চিমে ২৪১৫ কিলোমিটার দীর্ঘ। উত্তর-দক্ষিণে উহার বিস্তার মাত্র ৩২২ কিলোমিটার। দাক্ষিণাত্য মালভূমির উত্তর প্রান্তে দণ্ডায়মান **বিন্ধ্য-কাইমুর** নামক পর্বতশিরাটি এই সমভূমির দক্ষিণ সীমা নির্ধারণ করে। এই বিস্তীর্ণ সমভূমির পশ্চিমপ্রান্তে রাজস্থানের **আরাবল্লী** পর্বতের গর্ভে পৃথিবীর **প্রাচীনতম শিলাস্তর** ন্যস্ত। আরাবল্লী পাহাড়ের উত্তর ভাগে ভূগর্ভস্থ পর্বতশিরাটি উত্তর-দক্ষিণে প্রসারিত। উহা সিন্ধু ও গঙ্গা অববাহিকার মধ্যে অবস্থিত বলিয়া উভয় নদী-উপত্যকা নিজ নিজ বৈশিষ্ট্য বজায় রাখিয়াছে। ভারতের এই মধ্যের সমভূমিটি প্রকৃতপক্ষে **শতদ্রু, গঙ্গা** ও **ব্রহ্মপুত্র** এই তিনটি নদী পর্যঙ্কের অন্তর্গত। সমগ্র সমভূমি পলিমাটি দিয়া গড়া। দ্বিতীয় পাঠে কেবলমাত্র গাঙ্গেয় সমভূমির বর্ণনা দেওয়া হইল।

গাঙ্গেয় সমভূমি হিমালয়ের অন্তর্গত উত্তর প্রদেশের কুমায়ুন পর্বত, নেপাল উপত্যকা ও পশ্চিমবঙ্গের উপ-পার্বত্য অঞ্চলের ঠিক দক্ষিণে অবস্থিত। এই অঞ্চলটি গঙ্গা নদী ও উহার উপনদীগুলির দ্বারা বিধৌত। দক্ষিণে উহা বিন্ধ্য-কাইমুর পর্বতশিরা ও ছোটনাগপুর মালভূমি পর্যন্ত প্রসারিত। বিহার রাজ্যের রাজমহল পাহাড় পার হইয়া ভূভাগের ঢাল অনুযায়ী গঙ্গানদী দক্ষিণ দিকে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যে প্রবেশ করিয়াছে ও দক্ষিণ-পূর্ব দিকে প্রবাহিত হইয়া মুর্শিদাবাদ জিলার ধুলিয়ানের নিকট **ভাগীরথী** ও **পদ্মা** নামে দুই শাখায় বিভক্ত হইয়াছে। পদ্মা বাংলাদেশের ভিতর দিয়া এবং ভাগীরথী পশ্চিমবঙ্গের ভিতর দিয়া প্রবাহিত হইয়া বঙ্গোপসাগরে পতিত হইয়াছে। পূর্বভাগে ব্রহ্মপুত্র নদ মানস সরোবরের নিকট হইতে উত্থিত হইয়া হিমালয়ের উত্তর দিক দিয়া পূর্বমুখে প্রবাহিত হইয়া আসাম রাজ্যে প্রবেশ

করিয়া পশ্চিমদিকে প্রবাহিত হয় এবং আসাম রাজ্য বিধৌত করতঃ পরিশেষে বাংলাদেশে প্রবেশ করার পর উহা হইতে যমুনা নামে একটি শাখা গঙ্গার শাখানদী পদ্মার সহিত মিলিত হইয়াছে। ফলে, এক বিশাল ব-দ্বীপের সৃষ্টি হইয়াছে। এই ব-দ্বীপের উত্তরদিকের ভূভাগ এই দুই নদীর উপনদীগুলি দ্বারা বিধৌত বলিয়া উহাও সমভূমি। বস্তুতঃ সমভূমিটি পশ্চিম দিকে **শতদ্রু সমভূমি** হইতে পূর্ব দিকে **ব্রহ্মপুত্র সমভূমি** পর্যন্ত প্রসার লাভ করিয়াছে। পূর্বভাগে গঙ্গা-সমভূমির কিয়দংশ বিদেশী রাষ্ট্র বাংলাদেশের অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে। ভারতে গঙ্গা-সমভূমিটির পূর্বভাগ পশ্চিমবঙ্গ দ্বারা সীমাবদ্ধ।

সমভূমির উত্তরাংশে পর্বতের পাদদেশে সঞ্চিত পদার্থের মধ্যে বেশীর ভাগ নুড়ি-পাথর ও বালি। ফলে, এখানকার ছোট নদীগুলি পর্বতের পাদদেশে আসিয়াই কাঁকর, নুড়ি ও বালির মধ্যে অদৃশ্য হয়। কিছু দক্ষিণে গিয়া ইহারা আবার বাহির হয় ও জলাভূমির সৃষ্টি করে।

পর্বতের পাদদেশের অপেক্ষাকৃত উচ্চ ও ঢালু নুড়ি-পাথরযুক্ত এই অংশকে **ভাবর** (Bhabar) বলে। ইহার দক্ষিণেই **তরাই**। উহাতে স্থানে স্থানে জলাভূমি আছে। সমভূমির প্রাচীন পলিযুক্ত অংশগুলির নাম **'ভাঙ্গর'** ও নদীর নিকটবর্তী উর্বর নূতন পলিযুক্ত অংশের নাম **'খাদর'**। ভাঙ্গর ভূমিগুলি নদী হইতে দূরে অপেক্ষাকৃত উচ্চ ভূমি রূপে অবস্থান করে। যমুনার পশ্চিমে অপেক্ষাকৃত শুষ্ক আবহাওয়ার জন্য তরাই গঠিত হয় নাই। গঙ্গা নদীর পূর্বতীরে মোরাদাবাদ ও বিজনৌর জেলা দুইটিতে এক প্রকার বালুকাময়, অল্প উচ্চ ঢেউ খেলানো ভূমি দেখা যায়। উহাদের **'ভুর'** বলে।

প্রাচীন ভাঙ্গর ভূমির অনেক স্থানে রাসায়নিক রূপান্তরে চুণ জাতীয় পদার্থের আধিক্য দেখা যায়। ঐরূপ ভূমিকে **কঙ্কর** ভূমি বলে। অনেক স্থলে লবণের আধিক্যযুক্ত ভূমিকে **রেয়া** বা **কাল্লার** ভূমি বলে।

সমগ্র গঙ্গাসমভূমি অঞ্চলে ভূ-বৈচিত্র্য বিশেষ নাই। কেবল 'ভাঙ্গর' আর 'খাদর' ভূমির উচ্চতার সামান্য পার্থক্য এবং নদী-উপনদীগুলির খাত এই দিগন্তবিস্তৃত একঘেয়ে ভূমির সামান্য বৈচিত্র্য সৃষ্টি করিয়াছে। বড় নদীগুলি গতিপথ পরিবর্তন করায় তাহাদের পরিত্যক্ত পথে যে বদ্ধজলা বা বিল সৃষ্ট হইয়াছে, বর্ষার সময় সেগুলি যখন দিগন্তপ্রসারী জলভাগে পরিণত হয়, তখন একটানা প্রান্তরগুলির মধ্যে কিছুটা ছেদ ঘটে। অবশ্য আম প্রভৃতি সুমিষ্ট ফলের বাগানে ঘেরা গ্রামগুলি চক্ষুকে অনেকটা শান্তি দেয়।

বর্ষার সময় এই সমভূমির সর্বত্র সবুজের সমারোহ দেখা যায়। এমন কি উষর

প্রান্তরগুলিও সবুজ ঘাসে ঢাকিয়া যায়। কৃষিক্ষেত্রগুলিতে সবুজ শস্য বাতাসে দুলিতে থাকে। কিন্তু বসন্তকালে ফসল কাটিয়া লইবার পর তৃণহীন মাঠ ও শস্যহীন কৃষিক্ষেত্র মরুবৎ আকার ধারণ করে। যতই পশ্চিমে যাওয়া যায়, ভূমির এই অবস্থা ততই চোখে পড়ে।

এই বিশাল গঙ্গাসমভূমিকে একটি বৃহৎ ভৌগোলিক অঞ্চল বলা হয়। ইহাকে প্রাকৃতিক পরিবেশের তারতম্য অনুসারে তিনটি ক্ষুদ্র অঞ্চলে ভাগ করা যায়। উহারা **(১) উচ্চ গাঙ্গেয় সমভূমি অঞ্চল, (২) মধ্য গাঙ্গেয় সমভূমি অঞ্চল** ও **(৩) নিম্ন গাঙ্গেয় সমভূমি বা ব-দ্বীপ অঞ্চল।**

(১) **উচ্চ গাঙ্গেয় সমভূমি অঞ্চল** বলিতে দিল্লী ও উত্তর প্রদেশের সমভূমিকে বুঝায়। (২) **মধ্য গাঙ্গেয় সমভূমি অঞ্চল** বিহার রাজ্যের সমগ্র উত্তরাংশ ও দক্ষিণের সামান্য অংশ লইয়া গঠিত এবং (৩) **নিম্ন গাঙ্গেয় সমভূমি অঞ্চলে** পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যমান।

(১) উচ্চ গাঙ্গেয় সমভূমি অঞ্চল

প্রাকৃতিক পরিবেশ—

অবস্থান ও ভূপ্রকৃতি ঃ এই অঞ্চলটি গঙ্গা-সমভূমির পশ্চিমভাগ লইয়া গঠিত। দিল্লী ও উত্তর প্রদেশের সমভূমি ইহার অন্তর্গত। অঞ্চলটি গঙ্গা ও উহার উপনদীগুলির দ্বারা বিধৌত। উপনদীগুলির মধ্যে **যমুনা, রামগঙ্গা, গোমতী** ও **ঘর্ঘরা** অন্যতম। ঘর্ঘরা উপনদীর উৎসভাগে অপর দুইটি নদী **সারদা** ও **রাপ্তী** মিলিত হইয়াছে। এই অঞ্চল ২৫° উঃ—৩০° উঃ অক্ষাংশের এবং ৭৭° ১০ পূঃ—৮৩° পূঃ দ্রাঘিমাংশের মধ্যের ভূভাগ লইয়া গঠিত।

এই সমভূমির উত্তর প্রান্ত ভাবর ও তরাই অঞ্চলের অংশমাত্র। উহা অধিক নুড়ি-পাথর ও বালুকা মিশ্রিত মাটি দিয়া গড়া। ঐ অঞ্চলে বনভূমি এবং স্থানে স্থানে জলা ও আবাদী জমি দেখা যায়। গভীর বনে **শাল** ও **দেবদারু** বৃক্ষগুলি সারি দিয়া দণ্ডায়মান। উচ্চ গাঙ্গেয় সমভূমির দক্ষিণ সীমা দাক্ষিণাত্য মালভূমির পুরোভাগ বন্ধুর শিলাময় অঞ্চলের শুষ্ক ও অনুর্বর অংশ লইয়া রচিত। উত্তর ও দক্ষিণ উভয় ভাগের মধ্যে বিস্তীর্ণ সমভূমি নদীবাহিত পলল মৃত্তিকা দ্বারা গঠিত। এই অঞ্চলের দো-আঁশ মৃত্তিকা কৃষির উপযুক্ত। অঞ্চলটির উত্তরভাগের সাধারণ ঢাল উত্তর হইতে দক্ষিণে এবং দক্ষিণভাগে উহা পশ্চিম হইতে পূর্বে।

জলবায়ু ঃ অঞ্চলটিতে মৌসুমী বায়ু প্রবাহিত হয়। গ্রীষ্মকালীন মৌসুমী বাতাসে অধিক বৃষ্টিপাত হয়। বৃষ্টিপাত পূর্ব ভাগে অপেক্ষাকৃত বেশী, কিন্তু পশ্চিমাংশে

কম। পূর্বভাগে স্থান বিশেষে বার্ষিক গড় বারিপাত ১০১·৬ সে. মি.। কিন্তু পশ্চিমভাগে উহা ৭৬·২ সে. মিটারের কম। তাপ অনেকটা চরমভাবাপন্ন। শীতকালে যেমন ঠাণ্ডা, গ্রীষ্মকালে তেমনি গরম। বাতাস ততটা আর্দ্র নয়, মোটামুটি শুষ্ক বলা যায়।

উদ্ভিদ ঃ সমভূমির উত্তরভাগে বনভূমি অধিক। এইখানকার বনভূমিতে শাল, সেগুন, জারুল, বাঁশ ও বেত প্রচুর জন্মে।

খনিজ সম্পদ ঃ উচ্চ গঙ্গা সমভূমি অঞ্চলে খনিজ সম্পদ নাই বলা চলে।

অর্থ নৈতিক ও সামাজিক পরিবেশ—

অধিবাসী ঃ আগেই বলা হইয়াছে, উচ্চ গাঙ্গেয় সমভূমি অঞ্চলটি মূলতঃ দিল্লী ও উত্তর প্রদেশ রাজ্য লইয়া গঠিত। এইখানে উত্তর প্রদেশের প্রায় ৮·৫ কোটি ও দিল্লীর প্রায় ৪০ লক্ষ লোকের বাস। প্রতি বর্গ কিলোমিটারে লোকবসতির ঘনত্ব ৩৩০ জন। অধিবাসীদের মধ্যে প্রায় ৭·৪ কোটি হিন্দু, ১·১ কোটি মুসলমান, ৩·৮ লক্ষ শিখ, ১·৩ লক্ষ খৃষ্টধর্মাবলম্বী ও ১·২ লক্ষ জৈন। ইহা ছাড়া অন্যান্য ধর্মাবলম্বী লোকও বাস করে। উহাদের সংখ্যা সামান্য।

অধিবাসীদের অধিকাংশ হিন্দী ভাষাভাষী। উর্দু, বাংলা ও পাঞ্জাবী ভাষাভাষী লোকও এখানে বাস করে। বহু লোক ইংরাজি ভাষায় কথা বলিতে, লিখিতে ও পড়িতে পারে।

জলসেচ ঃ অঞ্চলটিতে জলসেচ ব্যবস্থার বিশেষ গুরুত্ব রহিয়াছে। নদী হইতে খাল কাটিয়া ও ভূভাগে গভীর নলকূপ খনন করিয়া এবং কূপ, বিল, ঝিল ইত্যাদি হইতে জল তুলিয়া জলসেচ করা হয়। এই অঞ্চলে কৃষিকার্যের উপর শতকরা ৭৫ জন লোক নির্ভরশীল। তাই অঞ্চলটিতে কৃষিকার্যের গুরুত্ব খুব বেশী। কৃষিকার্যের জন্য জলের একান্ত প্রয়োজন। উচ্চ গাঙ্গেয় সমভূমি অঞ্চলে বৃষ্টিপাত অনিয়মিত এবং চাষের পক্ষে যথেষ্ট নহে। গম, যব, ডাল ইত্যাদি রবিশস্য গুলির চাষ শীতকালেও হয়, কিন্তু শীতকালে বৃষ্টিপাত কম হয়। কৃষিকার্য জলসেচের উপর অধিক নির্ভরশীল।

পশ্চিমভাগে **গঙ্গার উচ্চ** ও **নিম্ন খাল, যমুনার পূর্ব** ও **পশ্চিম খাল, আগ্রা খাল, বেতোয়া খাল** ও **বিজনোর খাল** বিখ্যাত।

পূর্বভাগে **সারদা খালের** প্রথমটি হইতে জল লইয়া উত্তরপ্রদেশের **খেরী, সীতাপুর, বড়াবাঁকি, সুলতানপুর, জৌনপুর, আজমগড়** ও **গাজীপুর** জিলাগুলির কৃষিজমিতে জলসেচ করা হয়।

সারদা খালের দ্বিতীয়টি**হারদোই, লক্ষ্ণৌ, উনাও, রায়বেরিলি, প্রতাপগড়, জৌনপুর** ও**এলাহবাদ** জিলাগুলির কৃষিজমিতে জলসেচ করে। এই অঞ্চলে স্থানে স্থানে বৃহৎ নলকূপ খনন করা হইয়াছে এবং জলবিদ্যুৎ দ্বারা চালিত পাম্প সাহায্যে নলকূপের জল তুলিয়া জমিতে জলসেচ করা হইতেছে। মাটির নীচে অল্প গভীরতায় জল পাওয়া যায় বলিয়া এই ভাবে জলসেচ করা সহজ।
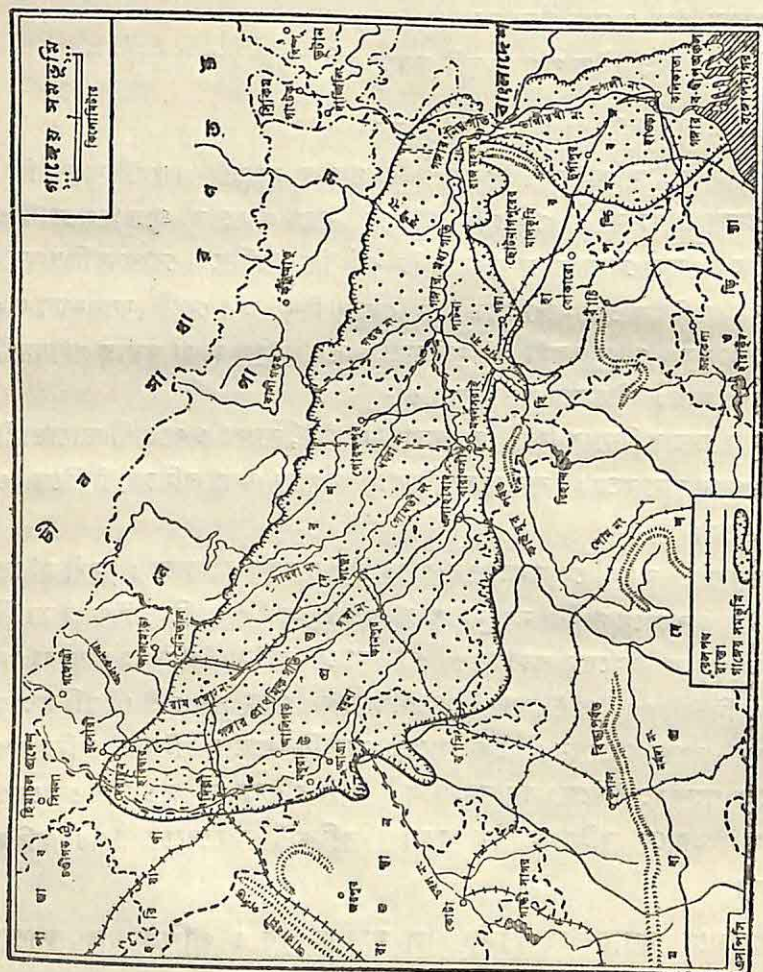
কৃষিঃ গাঙ্গেয় সমভূমির মুখ্য উপজীবিকা কৃষি। প্রাচীন পলিমাটিযুক্ত ভাঙ্গর অঞ্চলে কৃষিকার্য বেশী হয়। অঞ্চলটির ৭৫ শতাংশ অধিবাসী কৃষিজীবী। **ধান** ও **গম** প্রধান খাদ্যশস্য। **ভুট্টা, বাজরা, জোয়ার, যব, ছোলা** ও নানা প্রকার **ডাল** এই অঞ্চলে উৎপন্ন হয়। **তৈলবীজ, আলু, তামাক** ও **ইক্ষু চাষ হয়।**

বাণিজ্যিক ফসল (Cash Crop) হিসাবে ইক্ষু বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। সবচেয়ে ভাল ইক্ষু উৎপাদক অঞ্চল উত্তর দিকের বৃষ্টিবহুল জেলাগুলি—সাহারানপুর, মীরাট, মজঃফরনগর, বিজনৌর, মোরাদাবাদ প্রভৃতি। এখানকার দোয়াঁশ মাটি এবং উত্তম জলসেচ ব্যবস্থা ইক্ষু চাষের বিশেষ সহায়ক। ফলে স্বভাবতই এই অঞ্চলে উত্তর প্রদেশ রাজ্যে সর্বাপেক্ষা বেশী চিনি উৎপাদন হয়। গাজীপুরে **আফিং** চাষ হয়। অঞ্চলটির পশ্চিমভাগে জলসেচ অঞ্চলে **তুলা** এবং শুষ্ক অঞ্চলে **জোয়ার, বাজরা, রাগী** (মিলেট, Millet) উৎপন্ন হয়। **তিল** ও **সরিষার** চাষ অধিক হওয়ায় সরিষার তৈল ও তিলের তৈল কারখানায় প্রস্তুত হয়। আজকাল **চীনাবাদামের** চাষ বাড়িয়াছে। নৈনিতাল অঞ্চলে **পাট** জন্মে। প্রতি বৎসর কমপক্ষে ৩ লক্ষ বেল পাট উৎপন্ন হয় ; প্রতি বেলের ওজন প্রায় ১৮০ কিলোগ্রাম।

গৃহপালিত পশু ঃ অঞ্চলটিতে গবাদি পশু পালিত হয়। ফলে অঞ্চলটিতে দুগ্ধ ও দুগ্ধজাত সামগ্রী যথেষ্ট পাওয়া যায়।

শ্রমশিল্প ঃ অঞ্চলটিতে শ্রমশিল্প ও কুটীরশিল্প সম ভাবে উন্নতির পথে। শ্রম শিল্পের মধ্যে **কাপড় কল, চিনির কারখানা, তেলের কল, পশম কারখানা, রেশম কারখানা, ঔষধ ও রাসায়নিক দ্রব্যের কারখানা, রেলইঞ্জিন কারখানা, চামড়া ও জুতার কারখানা** প্রধান। **এই অঞ্চলে ভারতের সর্বাধিক চিনির কল রহিয়াছে।** পূর্বদিকে গোরখপুর হইতে পশ্চিম দিকে জৌনপুর, ফরাক্কাবাদ, লক্ষ্ণৌ, কানপুর ও মীরাট হইয়া সাহারানপুর পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চলে ৭১টি চিনির কলে প্রচুর চিনি প্রস্তুত হয়। **কানপুরে** বস্ত্রশিল্প, পশম শিল্প, চামড়ার কারখানা ও কৃষিজ দ্রব্য হইতে উৎপন্ন তৈল কারখানাগুলি শ্রীবৃদ্ধির পথে চালিত। **দিল্লীর** বস্ত্রশিল্প, দুগ্ধকেন্দ্র ও অন্যান্য কারখানা প্রসিদ্ধ।

লক্ষ্ণৌতে রসায়ন শিল্প ও ঔষধ শিল্প এবং **বারাণসীতে** রেল ইঞ্জিন কারখানা, সিমেণ্ট কারখানা ও রসায়ন শিল্প উন্নতির পথে। **আগ্রা** চামড়া ও পশম কারখানার জন্য প্রসিদ্ধ। বর্তমানে **সার, রসায়ন, কাঁচ** ও **মদ্য** প্রস্তুতকারী কারখানাগুলি আধুনিক সাজ-সরঞ্জাম ও যন্ত্রাদি দ্বারা চালু রহিয়াছে। এই অঞ্চলে ৩১টি কাপড়ের কল স্থাপিত রহিয়াছে।

অঞ্চলটি **কুটীরশিল্পে** বেশ উন্নত। বারাণসীতে **রেশম-শিল্প**, মির্জাপুরে **গালার জিনিস** প্রস্তুত কারখানা, চুনারে **মৃৎশিল্প**, জৌনপুরে ও গাজীপুরে **আতর ও গোলাপজল** প্রস্তুত করার কারখানা, আলিগড়ে **তালা, ঘি ও মাখন** প্রস্তুত কারখানা, মোরাদাবাদে **কাঁসা** ও **পিতলের** বাসন প্রস্তুত কারখানা, কনৌজে

চন্দনতৈলের কারখানা, আগ্রায় **কাঁচ, পাথর ও কাঠের** জিনিস প্রস্তুত কারখানা, ফিরোজাবাদে **কাঁচের জিনিস** এবং মির্জাপুর ও আগ্রায় **গালিচা ও সতরঞ্চি** প্রস্তুত কারখানা কুটীরশিল্পের অন্তর্গত। ইহা ছাড়া **তাঁতশিল্প** সারা অঞ্চলটিতে ছড়ানো রহিয়াছে। বস্ত্র, চাদর, তোয়ালে ও গামছা প্রভৃতি সামগ্রী তাঁতশিল্পে প্রস্তুত হয়।

বিদ্যুৎ ঃ অঞ্চলটিতে তাপবিদ্যুৎ ও জলবিদ্যুৎ দ্বারা শহর ও গ্রাম আলোকিত করা, নলকূপে ভূগর্ভস্থ জল তোলা, কারখানার যন্ত্রপাতি চালানো ও রেলপথে রেলগাড়ী চালানো হয়। বর্তমানে কমপক্ষে ২০০টি গ্রামে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হয়। ২১০৬৪টি নলকূপ হইতে বিদ্যুৎ শক্তি দ্বারা চালিত পাম্পে জল তোলা হয়। উহাতে জলসেচ ব্যবস্থা উন্নততর হইয়াছে। **উত্তরপ্রদেশ বিদ্যুৎ সংস্থা** বিদ্যুৎ সরবরাহ করিয়া থাকে। বিদ্যুৎ উৎপাদন ব্যবস্থা রহিয়াছে—**রিহান্দ জলবিদ্যুৎ পরিকল্পনায়, যমুনা জলবিদ্যুৎ ব্যবস্থায়, হারদুয়াগঞ্জ তাপ-বিদ্যুৎ কেন্দ্রে, কানপুর নব তাপ-বিদ্যুৎ কেন্দ্রে** এবং অন্যান্য ছোট বড় তাপ-বিদ্যুৎ উৎপাদন পরিকল্পনায়।

পরিবহণ ও বাণিজ্য ঃ অঞ্চলটির মধ্য দিয়া রাজপথ, রেলপথ ও নাব্য নদী পরিবহণে সহায়তা করে। কেন্দ্রীয় ও রাজ্য-সংক্রান্ত সড়কগুলি সদর শহর ও রাজধানী হইতে সীমানার দিকে ছড়ান রহিয়াছে। অঞ্চলটিতে রাজপথের মোট দৈর্ঘ্য প্রায় ৪০ হাজার কিলোমিটার। উহার মধ্যে প্রায় ৩০ হাজার কিলোমিটার দৈর্ঘ্যের সড়ক পাকা। গ্রামের রাস্তা এখনও অনেক স্থলে কাঁচা। পাকা রাস্তায় মোটরগাড়ী অধিক চলাফেরা করে। অঞ্চলটির মধ্য দিয়া **পূর্ব রেলপথ, উত্তর রেলপথ** এবং **উত্তর পূর্ব রেলপথ** আরোহী ও মালপত্র পরিবহণ করে। পূর্ব ও উত্তর রেলপথদ্বয় **ব্রডগেজ** এবং উত্তর-পূর্ব রেলপথটি **মিটার গেজ**। বারাণসী, লক্ষ্ণৌ, কানপুর ও বেরিলি স্টেশনে ব্রড গেজ ও মিটার গেজ রেললাইন পাশাপাশি পাতা। দিল্লী শহরে মধ্য, পশ্চিম ও উত্তর রেলপথগুলি মিলিত হইয়াছে। আঞ্চলিক নদীগুলি নাব্য। নদীপথে বহুদূর যাওয়া যায়। এই বিষয়ে গঙ্গা নদীর উপযোগিতা যথেষ্ট। অঞ্চলটিতে কয়েকটি বিমানঘাঁটি বিদ্যমান। ইহাদের মধ্যে **পালাম, লক্ষ্ণৌ, এলাহাবাদ, বারাণসী, কানপুর, আগ্রা ও গোরক্ষপুর** প্রধান। পালাম বিমানঘাঁটিতে অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক বিমানপোতসমূহ উঠা-নামা করে। পালাম বিমানঘাঁটিটি দিল্লী শহরের উপকণ্ঠে অবস্থিত।

প্রসিদ্ধ স্থান ঃ লক্ষ্ণৌ—উত্তরপ্রদেশ রাজ্যের রাজধানী। **দিল্লী**—প্রজাতন্ত্রী ভারতরাষ্ট্রের রাজধানী। দিল্লীর **কুতুবমিনার, জুম্মা মসজিদ ও মোতি মসজিদ** মুসলমানযুগের স্থাপত্যের নিদর্শন। দিল্লীর নিকটে **ইন্দ্রপ্রস্থ** পাণ্ডবদের রাজধানী

ছিল। **কানপুর**—বাণিজ্যিক শহর। শ্রমশিল্পের জন্য বিখ্যাত। **বারাণসী**—গঙ্গানদীর তীরে হিন্দুদিগের তীর্থস্থান। এখানকার হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় প্রসিদ্ধ। বারাণসী রেশমশিল্পের কেন্দ্রস্থল। বারাণসীর অনতিদূরে **সারনাথ**—বৌদ্ধদের প্রাচীন শহর। **এলাহাবাদ** বা প্রয়াগ শহর গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতী এই তিন নদীর সঙ্গমস্থলে অবস্থিত। এইজন্য ইহার অপর নাম ত্রিবেণী। ইহা হিন্দুদিগের তীর্থস্থান। এইখানে প্রতি বার বৎসর ও ছয় বৎসর অন্তর যথাক্রমে কুম্ভমেলা ও অর্ধকুম্ভমেলা অনুষ্ঠিত হয়। সেই সময় মকর সংক্রান্তিতে বহু সাধু-সন্ন্যাসী এখানে স্নান করিতে আসেন। এলাহাবাদে সেনানিবাস রহিয়াছে। নদীর সঙ্গমস্থলের প্রাচীন নাম **প্রয়াগ**। **আগ্রা**—মোগল বাদশাহের কীর্তিস্থান। যমুনার তীরে মর্মর সৌধ **তাজমহল** পৃথিবীর সাতটি আশ্চর্যের মধ্যে একটি। দিল্লীর সম্রাট শাহজাহান কর্তৃক তাঁহার মহিষী মমতাজমহলের স্মৃতিরক্ষার জন্য ইহা নির্মিত হয়। ইহার অনুপম ভাস্কর্য ও নির্মাণকৌশল দেখিতে বহু পর্যটকের সমাগম হয়। আগ্রার কুটীরশিল্পও প্রসিদ্ধ। এখানকার জুতা, গালিচা ও সতরঞ্চি জগদ্বিখ্যাত। **আলিগড়**—মাখন, ঘৃত ও তালার জন্য প্রসিদ্ধ। এইখানকার বিশ্ববিদ্যালয় বিখ্যাত। **মোরাদাবাদ**—কাঁসা ও পিতলের বাসন প্রস্তুতের জন্য প্রসিদ্ধ। শিক্ষাকেন্দ্র হিসাবে **রুড়কি, বারাণসী, আগ্রা, এলাহাবাদ, আলিগড়, দিল্লী** ও **লক্ষ্ণৌ** বিশ্ববিদ্যালয় বিখ্যাত। **মীরাট, বেরিলি, আগ্রা, ফতেগড়, বারাণসী, এলাহাবাদ, কানপুর** ও **লক্ষ্ণৌ** সেনানিবাস হিসাবেও প্রসিদ্ধ। **হরিদ্বার, বৃন্দাবন** ও **অযোধ্যা** হিন্দুদের তীর্থস্থান। **নৈনিতাল, দেরাদুন** ও **বিন্ধ্যাচল** স্বাস্থ্যনিবাস। **সেকেন্দ্রা**—আকবরের সমাধি মন্দিরের জন্য প্রসিদ্ধ।

(২) মধ্য গাঙ্গেয় সমভূমি অঞ্চল

প্রাকৃতিক পরিবেশ—

অবস্থান ও ভূ-প্রকৃতিঃ বিহার রাজ্যের উত্তর ভাগ মধ্য গাঙ্গেয় সমভূমি অঞ্চলের অন্তর্গত। উহা নদীবাহিত পলল মৃত্তিকা দ্বারা গঠিত। মৃত্তিকায় অধিক পরিমাণে পলি থাকায় উহা বেশ উর্বর এবং উদ্ভিদ-খাদ্যপ্রাণে পুষ্ট। হিমালয় পর্বতমালার পাদদেশ হইতে দক্ষিণদিকে ছোটনাগপুর মালভূমির উত্তরভাগ পর্যন্ত বিস্তৃত এই সমভূমিটির সাধারণ ঢাল পশ্চিম হইতে পূর্বদিকে। গঙ্গানদী সেইভাবে পশ্চিম হইতে পূর্বদিকে প্রবাহিত। উপনদীগুলির মধ্যে অনেকগুলি হিমালয় পর্বত হইতে উত্থিত হইয়া দক্ষিণদিকে প্রবাহিত হইয়া পরে গঙ্গানদীতে মিশিয়াছে। গঙ্গার গতিপথে এই অঞ্চলে বামতীরের উপনদী **গণ্ডক** ও **কুশী** প্রধান। দক্ষিণ তীরের

উপনদী **শোন** ছোটনাগপুর মালভূমি হইতে উত্থিত হইয়া ক্রমশঃ উত্তরদিকে প্রবাহিত হইয়া গঙ্গানদীতে মিশিয়াছে। উহা অনেকটা উত্তরবাহিনী। গঙ্গা উপত্যকার সমভূমির স্থানে স্থানে উর্বর মাটিতে চুন মিশ্রিত থাকায় চাষবাসের বিশেষ সুবিধা হইয়াছে।

বর্ষাকালে এই অঞ্চলের নদীগুলিতে প্রায়ই বন্যা হয়। পার্বত্য অঞ্চলে নদীগুলির সুবিস্তৃত অববাহিকা রহিয়াছে। আকস্মিক প্রবল বৃষ্টিপাত হইলে যে প্রচণ্ড জলধারা নামিয়া আসে তাহা ধারণ করার ক্ষমতা নদীগুলির থাকে না, ফলে দুই কূল বন্যার প্লাবনে ভাসিয়া যায় এবং জনসাধারণের গভীর দুঃখের কারণ হয়। এই কারণে কোশীকে বলা হয় 'বিহারের দুঃখ'।

সমভূমিটির উত্তরদিকে পূর্ব-হিমালয়; পূর্বদিকে নিম্নগাঙ্গেয় সমভূমি বা ব-দ্বীপ অঞ্চল, দক্ষিণদিকে ছোটনাগপুর মালভূমি এবং পশ্চিমদিকে উচ্চ গাঙ্গেয় সমভূমি অঞ্চল। আয়তনে অঞ্চলটি ৮৭ হাজার বর্গ কিলোমিটার। এই অঞ্চল ২৬° উঃ—২৭° উঃ অক্ষাংশের এবং ৮৩° পূঃ—৮৮° দ্রাঘিমাংশের মধ্যে অবস্থিত।

জলবায়ুঃ মধ্য গাঙ্গেয় সমভূমি অঞ্চলটিতে **মৌসুমী জলবায়ু** বিরাজমান। অঞ্চলটিতে শীতাতপের তীব্রতা পূর্ব হইতে পশ্চিমদিক ক্রমশঃ বৃদ্ধি পায়। গ্রীষ্মকালে পশ্চিম দিকে তাপ অধিক এবং শীতকালে সেখানে তাপ অত্যন্ত কম। বৃষ্টিপাত পূর্ব হইতে পশ্চিম দিকে কম। বার্ষিক গড় বারিপাত পূর্বভাগে ১২৭ সে. মি. এবং পশ্চিম ভাগে উহা ১০১·৬ সে. মি.। নিম্ন গাঙ্গেয় সমভূমি অঞ্চলে অবস্থিত পশ্চিমবঙ্গ অপেক্ষা এই অঞ্চলে শীত ও গ্রীষ্মের তীব্রতা সাধারণতঃ অধিক।

উদ্ভিদ ঃ অঞ্চলটির উত্তর ও দক্ষিণ ভাগে গহন বনভূমি। উত্তরে **তরাইয়ের বনভূমি** সমভূমিতে নামিয়া আসিয়াছে। সেখানে শাল, সেগুন, জারুল, মহুয়া ও পলাশ উল্লেখযোগ্য বৃক্ষ। দক্ষিণ ভাগে **ছোটনাগপুর মালভূমির** সীমানায়, শাল, সেগুন, কেঁদ, মহুয়া ও পলাশ প্রভৃতি বৃক্ষের সমভূমি বিদ্যমান। স্থান বিশেষে বাঁশ ও বেত জন্মে। বনভূমির কোন কোন স্থানে **রেশমগুটি** এবং বনবৃক্ষ হইতে **লাক্ষা** সংগৃহীত হয়। **ভাগলপুর জিলায়** গুটি হইতে মুগা-সূতা বাহির করিয়া বস্ত্র বয়ন করা হয়।

খনিজ সামগ্রী ঃ অঞ্চলটির দক্ষিণ অংশ খনিজ সামগ্রীতে পুষ্ট। দাক্ষিণাত্যের ছোটনাগপুর মালভূমির সহিত সরবরাহসূত্রে আবদ্ধ এই অঞ্চলটিতে খনিজ **এ্যালুমিনিয়াম** বা **বক্সাইট** ও **পাইরাইট** খনি হইতে উত্তোলিত হয়। এই অঞ্চলের ঠিক দক্ষিণ-পশ্চিমে সাহাবাদ জিলায় পাইরাইট খনি বিদ্যমান। মুঙ্গের ও ভাগলপুর জিলাদ্বয়ে **অভ্রখনি** রহিয়াছে। খনি হইতে উচ্চমানের রুবি অভ্র উত্তোলিত হয়।

এই অঞ্চলের সমভূমিতে এককালে **ক্ষার** উদ্ধার করিয়া **সোডা** বা **ক্ষারমাটি** প্রস্তুত করা হইত।

অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিবেশ—

অধিবাসী ঃ এই অঞ্চলের অধিবাসীদের সংখ্যা কমপক্ষে পাঁচ কোটি। লোকবসতির ঘনত্ব প্রতি বর্গ কিলোমিটারে ৫৭৫ জন। এখানকার উর্বর জমি কৃষির উপযোগী। কৃষিজ ফসল, মাঝারি শিল্প কারখানা পরিচালনায় সহায়তা করে। কুটীরশিল্প, মাঝারি শিল্প ও কৃষি জীবিকার্জনে অধিক সুযোগ প্রদান করায় এই অঞ্চলে লোকবসতির ঘনত্ব এত বেশী।

অঞ্চলটিতে হিন্দু, মুসলমান, শিখ, জৈন, বৌদ্ধ ও খৃষ্টধর্মাবলম্বী লোকেরা বাস করে। উহাদের মধ্যে হিন্দুর সংখ্যা সর্বাধিক। উ-ার পর মুসলমান, জৈন ও শিখের স্থান। স্থানে স্থানে খৃষ্টধর্মাবলম্বীরা বাস করে। অঞ্চলটিতে পুরুষ ও মহিলার সংখ্যার অনুপাত ১০০ : ৯৭। আঞ্চলিক অধিবাসীরা সবল ও কর্মঠ। কৃষি উহাদের মুখ্য জীবিকা। স্থানে স্থানে শিল্প কারখানা স্থাপিত হওয়ায় কিছু সংখ্যক লোক শিল্প কারখানায় নিযুক্ত রহিয়াছে। সরকারী ও বেসরকারী শিল্পসংস্থায় কর্মরত অধিবাসীর সংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে। শিল্প কারখানার সংখ্যা প্রায় ১৪ হাজার। এই কারখানাগুলিতে কমপক্ষে ২ লক্ষ স্ত্রী-পুরুষ কর্মরত। বিদ্যুৎ উৎপাদন ও সরবরাহ ব্যবস্থায় বর্তমানে ৩০ হাজার লোক নিযুক্ত রহিয়াছে। ইহা ছাড়া বাণিজ্যিক সংস্থায় কিছু লোক নিযুক্ত আছে।

গৃহপালিত পশু ও প্রাণিজ সামগ্রী ঃ এই অঞ্চলে গবাদি পশু—গরু, মহিষ, ছাগল ও মেষ পালিত হয়। উহাদের দুগ্ধ বিশেষ খাদ্য হিসাবে গৃহীত হয়। দুগ্ধজাত সামগ্রীর মধ্যে **মিষ্টান্ন** প্রধান। গুঁড়া দুধ, পনীর ও গাঢ় দুধ বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে এখানে প্রস্তুত করার সুযোগ রহিয়াছে। উচ্চ গাঙ্গেয় সমভূমি ও মধ্য গাঙ্গেয় সমভূমি এই উভয় অঞ্চলের নানা স্থানে দুগ্ধ হইতে মাখন ও ঘৃত প্রস্তুত হয়। হাঁস-মুরগীও এই অঞ্চলে পালিত হয়। গবাদি পশু, হাঁস ও মুরগীর সংখ্যা বৃদ্ধির চেষ্টা চলিতেছে।

কৃষি ও জলসেচ ঃ এই অঞ্চলে শিল্পের প্রসার ঘটিলেও কৃষিই অধিকাংশ অধিবাসীর জীবিকার্জনের মুখ্য উপায়। আধুনিক কৃষি ব্যবস্থা প্রচলনে আজিকার মানুষ যত্নশীল। এই কারণে রাজ্য সরকার বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে কৃষি উন্নয়নে সচেষ্ট। এই বিষয়ে জলসেচের স্থান সর্বাগ্রে। ইহার পর সার, উন্নত বীজ ও কৃষিযন্ত্র স্থান পায়। অঞ্চলটির নানা স্থানে গভীর নলকূপ খনন করিয়া জলসেচ ব্যবস্থা প্রবর্তিত হওয়ায় কৃষিকার্যের বিশেষ সুবিধা হইয়াছে। জলসেচ ব্যবস্থা কুশী পরিকল্পনায় উন্নততর হইবে। কুশী-পরিকল্পনায় **হনুমাননগর** নামক স্থানে ক্ষুদ্র বাঁধ নির্মিত

হইয়াছে। বাঁধটির উভয় পার্শ্ব হইতে খাল কাটা হইয়াছে। খালের জল দিয়া **পূর্ণিয়া, ভাগলপুর, মুঙ্গের, সহর্ষ, দ্বারভাঙ্গা, মজঃফরপুর, সারন ও চম্পারন** জিলাগুলিতে জলসেচের ব্যবস্থা হইয়াছে। বাঁধের জল অঞ্চলটিতে **খারিফ ও রবি** উভয় প্রকার শস্য ভালভাবে উৎপন্ন হইবে। অঞ্চলটি অদূর ভবিষ্যতে গণ্ডক, বাগমতী ও চন্দন পরিকল্পনা দ্বারা উপকৃত হইবে।

ধান, পাট, তামাক, ইক্ষু ও ডাল বিশেষ খারিফ শস্য। **গম, ভুট্টা, তুলা, তৈলবীজ** ও কোন কোন স্থানে **ডাল** রবিশস্য হিসাবে উৎপন্ন হয়। **রাই, সরিষা, তিসি** ও রেড়ী প্রভৃতি **তৈলবীজ** প্রচুর জন্মে। এই অঞ্চলে **তামাক চাষ** বর্তমানে উন্নতির পথে। **ইক্ষু চাষে** অঞ্চলটির স্থান উল্লেখযোগ্য। ইক্ষু চাষ সর্বাধিক হয় উচ্চ গাঙ্গেয় সমভূমি অঞ্চলে। মধ্য গাঙ্গেয় সমভূমি অঞ্চল ইক্ষু চাষে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়া আছে। তামাক চাষে অঞ্চলটির দান যথেষ্ট। অঞ্চলটি **আম, লিচু ও কলারও** জন্য বিখ্যাত। জিলাগুলির মধ্যে **দ্বারভাঙ্গা** আম, **মজঃফরপুর** লিচু এবং **সারন ও চম্পারন** কলার জন্য প্রসিদ্ধ। **পাটনা, মুঙ্গের ও ভাগলপুর** জিলাত্রয়ে নানা রকমের ধান উৎপন্ন হয়। ভাগলপুর জিলায় রেশমের জন্য **তুঁত** গাছের চাষ হইয়া থাকে।

তুলা ও **পাট** চাষে সামান্য আয়তনের জমি ব্যবহৃত হওয়ায় উৎপাদন সামান্য। অঞ্চলটিতে **ধান, গম, ডাল, ইক্ষু ও তামাক** স্থানীয় চাহিদা অপেক্ষা অধিক উৎপন্ন হওয়ায় অতিরিক্ত সামগ্রী সন্নিহিত অঞ্চলগুলিতে রপ্তানি করা হয়।

বিদ্যুৎঃ অঞ্চলটি **বারৌনী তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র** এবং **পাত্রাটু (Patratu) তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র** হইতে বিদ্যুৎ পায়। প্রায় ৫০০ মেগাওয়াট তাপ-বিদ্যুৎ দ্বারা অঞ্চলটির প্রায় ৭৭২৪টি শহর ও গ্রাম আলোকিত হয় এবং প্রায় ৬৬ হাজার পাম্প দ্বারা জমিতে জলসেচ হয়।

শ্রমশিল্পঃ অঞ্চলটিতে **চিনির কল, সিগারেট কারখানা** ও **ধানকল** পূর্ব হইতে পশ্চিমদিকে প্রসার লাভ করিয়াছে। পূর্বভাগে বারৌনীতে **খনিজ তৈলশোধন কারখানা** সম্প্রতি স্থাপিত হইয়াছে। অঞ্চলটিতে **কাঁচ শিল্প** দ্রুত বিস্তার লাভ করিতেছে। পশ্চিমভাগে **সিমেণ্ট কারখানা** ও **মৃৎ শিল্প কারখানা** বহু লোককে জীবিকার্জনের সুযোগ দেয়। ইহা ছাড়া **অগ্নিকুণ্ডের ইট** প্রস্তুত করার কাজে গঙ্গার মধ্যগতি অঞ্চলে বহু লোক নিযুক্ত রহিয়াছে।

অঞ্চলটিতে **শ্রমশিল্পের** কয়েকটি **ছোট ছোট গণ্ডী** রচিত হইয়াছে। গণ্ডীগুলি বলিতে—ভাগলপুর, পূর্ণিয়া, মজঃফরপুর, চম্পারনের রামনগর, মুঙ্গেরের লক্ষীসরাই এবং সহর্ষের মুরলিগঞ্জ ও জসিডি অন্যতম প্রধান।

অঞ্চলটিতে শ্রমশিল্প ও কুটীর-শিল্প উন্নয়নের জন্য রাজ্যসরকার কয়েকটি সংস্থা স্থাপন করিয়াছেন। সংস্থাগুলির মূল উদ্দেশ্য—আর্থিক ও বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে কারখানা স্থাপন ও পরিচালন, শিল্পজাত সামগ্রীর উৎকর্ষসাধন, উৎপন্ন সামগ্রীর বিক্রয়-বাজার নির্ধারণ এবং পরিবহণ ও বিক্রয়ব্যবস্থা আধুনিক পদ্ধতিতে করিবার প্রয়াস। এই বিষয়ে পাটনায় পাঁচটি সংস্থা সক্রিয় রহিয়াছে। উহারা—

(১) বিহার ষ্টেট্ এ্যাগ্রো-ইণ্ডাস্ট্রিজ্ ডেভেলাপ্‌মেণ্ট কর্পোরেশন,

(২) বিহার ষ্টেট ফিনানসিয়াল কর্পোরেশন,

(৩) বিহার ষ্টেট ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ডেভেলাপ্‌মেণ্ট কর্পোরেশন,

(৪) বিহার ষ্টেট স্মল ইণ্ডাস্ট্রিজ্ কর্পোরেশন,

এবং (৫) বিহার ষ্টেট টেক্সট বুক পাবলিশিং কর্পোরেশন। এই সংস্থা রাজ্যের পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণ ও প্রকাশন পরিচালনা করিতেছেন।

পরিবহণ ও বাণিজ্যঃ অঞ্চলটির মধ্য দিয়া **রাজপথ, রেলপথ, জলপথ** ও **ব্যোমপথ** পরিবহণ কার্যে সাহায্য করে। স্থলপথে কেন্দ্রীয় সড়ক, রাজ্য সড়ক ও গ্রামীণ পথ শহর ও গ্রামকে যোগ করে। অঞ্চলটিতে পাকা ও কাঁচা রাস্তা বিদ্যমান উহার মধ্যে পাকা রাস্তার দৈর্ঘ্য মাত্র ১৬ হাজার কিলোমিটার। জাতীয় সড়ক ১৬০০ কিলোমিটার দীর্ঘ। গ্রামীণ পথ কমপক্ষে ৪৮০০ কিলোমিটার দীর্ঘ। হিমালয় হইতে উত্থিত গঙ্গার উপনদীগুলি দীর্ঘ সড়ক নির্মাণের অন্তরায়। অঞ্চলটির উত্তরভাগে **ব্রডগেজ** রেলপথ নির্মাণ ব্যয়-সাপেক্ষ। এই কারণে অঞ্চলটি **মিটারগেজ** রেলপথে যুক্ত। গঙ্গানদীর উত্তর ভাগে পূর্ণিয়া, মুঙ্গের, দ্বারভাঙ্গা ও মজঃফরপুর **উত্তর-পূর্ব রেলপথে** যুক্ত। গঙ্গার দক্ষিণে **পূর্ব রেলপথ ব্রডগেজ**। রেলপথে এবং রাজপথে মোটরগাড়ীতে আরোহী যাতায়াত করে ও পণ্যসামগ্রী নিত্য স্থানান্তরিত হয়।

গঙ্গা ও উহার উপনদীগুলি প্রায়ই নাব্য। নদীবক্ষে ও রাজপথে লোক যাতায়াত করে ও পণ্যসামগ্রী স্থানান্তরিত করা হয়।

বিমানপথে **পাটনা** প্রধান বিমানঘাঁটি। ভাগলপুরেও বিমানঘাঁটি প্রস্তুত হইয়াছে।

এই অঞ্চল হইতে **চাউল, ডাল, তামাক, চিনি** ও **মশলা** প্রভৃতি সামগ্রী রপ্তানি হয়। বিনিময়ে আমদানি করা হয় **পোষাক-পরিচ্ছদ, ঔষধ, বিলাসদ্রব্য, রাসায়নিক সামগ্রী, শিল্পজাত ইস্পাত সামগ্রী, যানবাহন** ও অন্যান্য **ধাতু সামগ্রী**।

প্রসিদ্ধ স্থানঃ পাটনা—বিহার রাজ্যের রাজধানী, গঙ্গার দক্ষিণ তীরে অবস্থিত; শহরটি গঙ্গা ও গণ্ডক নদীর মিলন স্থানে অবস্থিত। এইখানকার

বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিক্যাল কলেজ, বিধানসভা, হাইকোর্ট ও রাজভবন পর্যটকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। পাটনা কুটীরশিল্পে উন্নত। প্রাচীন **নালন্দার** বিশ্ববিদ্যালয়ের ধ্বংসাবশেষ ও **রাজগীরের** উষ্ণপ্রস্রবণ দেখিতে অনেক ভ্রমণার্থীর সমাবেশ হয়। এখানে পাটনা দিয়া যাইতে হয়। **ভাগলপুর**—গঙ্গাতীরে অবস্থিত শহর। ইহা রেশমশিল্প ও বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য বিখ্যাত। **মুঙ্গের**—অভ্রশিল্পের জন্য প্রসিদ্ধ। ইহার নিকটে **সীতাকুণ্ড** হিন্দুদের তীর্থস্থান। এইখানে একটি উষ্ণপ্রস্রবণ আছে। **দানাপুর**—সেনানিবাসের জন্য বিখ্যাত। **ডালমিয়ানগর**—মধ্য গাঙ্গেয় সমভূমির শ্রেষ্ঠ শিল্পকেন্দ্র। শোন নদীর তীরে সাহাবাদ জিলার অন্তর্গত। এখানকার **সিমেণ্ট** কারখানা বিখ্যাত। ইহার কাঁচামাল চুনাপাথর আসে নিকটস্থ রোটাস মালভূমি হইতে। ইহা ছাড়া কাগজ, চিনি, এসবেস্টস, প্লাইউড, নানাপ্রকার রাসায়নিক দ্রব্যের কারখানা আছে।

৩। নিম্ন গাঙ্গেয় সমভূমি অঞ্চল বা ব-দ্বীপ অঞ্চল

প্রাকৃতিক পরিবেশ—

অবস্থান ও ভূপ্রকৃতি : গঙ্গার মধ্যগতির পূর্বদিকে গঙ্গার নিম্নগতির ভূ-ভাগ অবস্থিত। নিম্নগতিতে গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্র নদ উভয়ের অবক্ষেপণে এক বিস্তীর্ণ ভূ-ভাগ সৃষ্ট হইয়াছে। উহা পলল মৃত্তিকা দ্বারা গঠিত। এখানকার পলল মাটিতে অঞ্চল হিসাবে কিছুটা পার্থক্য দেখা যায়।

পশ্চিমবঙ্গে গঙ্গা নদী মালদহ ও মুর্শিদাবাদ জিলাদ্বয়ের মধ্য সীমারেখা হিসাবে অতি সামান্য স্থান অধিকার করিয়া আছে। পূর্বদিকে মুর্শিদাবাদ জিলার ধুলিয়ানের নিকট নদীটি **ভাগীরথী-হুগলী** ও **পদ্মা** নামে দুইটি প্রধান শাখায় বিভক্ত হইয়াছে। পদ্মা বাংলাদেশের মধ্য দিয়া এবং ভাগীরথী-হুগলী পশ্চিমবঙ্গের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া ব-দ্বীপ সৃষ্টি করিয়া বঙ্গোপসাগরে পতিত হইয়াছে। এই বিস্তীর্ণ ব-দ্বীপের বৃহত্তর অংশ বাংলাদেশের এবং ক্ষুদ্রতর অংশ পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্গত। গঙ্গানদীর **উত্তর দিকে** পশ্চিমবঙ্গে মালদহ ও পশ্চিম দিনাজপুর জিলাদ্বয় নদীবাহিত প্রাচীন পলিমাটি দিয়া গড়া। অঞ্চলটি বিধৌত করিয়া **মহানন্দা** ও **পুনর্ভবা** নামে দুইটি উপনদী পদ্মার সহিত মিলিত হইয়াছে। উহারা হিমালয় পর্বত হইতে উৎপত্তিলাভ করিয়া গঙ্গানদীর বাম তীরের ভূ-ভাগ বিধৌত করিয়াছে।

এই অঞ্চলের পশ্চিমে ছোটনাগপুর মালভূমি হইতে উৎপত্তিলাভ করিয়া **দ্বারকা, ব্রাহ্মণী, অজয়, দামোদর, কাঁসাই** ও **রূপনারায়ণ** নদ ভাগীরথী-হুগলী নদীতে মিশিয়াছে। অপরাপর শাখানদীর মধ্যে **জলঙ্গী** ও **ইছামতী** প্রধান। উপকূলে হুগলী নদীর মোহনার পূর্বদিকে কয়েকটি নদী তটভূমির ভূভাগ বিচ্ছিন্ন করিয়া

বঙ্গোপসাগরে পড়িতেছে। উহাদের মধ্যে **মাতলা, গোসাবা** ও **হাঁড়িয়াভাঙ্গা** নদীগুলির নাম উল্লেখযোগ্য।

পূর্বেই বলা হইয়াছে, গঙ্গার নিম্নগতিতে ভারত যুক্তরাষ্ট্রের সীমান্ত রাজ্য **পশ্চিমবঙ্গ** অবস্থিত। গঙ্গার নিম্নগতির সামান্য ভূ-ভাগ জুড়িয়া ইহা বিদ্যমান। ইহা উত্তর-দক্ষিণে প্রশস্ত এবং পূর্ব-পশ্চিমে বেশ সঙ্কীর্ণ। অঞ্চলটির উত্তর ভাগে মালদহ ও পশ্চিম দিনাজপুর জিলাদ্বয় লাল-পীত মৃত্তিকা দ্বারা গঠিত। উপকূলের তটভূমি ব্যতীত দক্ষিণ ভাগ নবীন পলিমাটিতে পূর্ণ। এই পলিমাটি ফস্‌ফোরাস্‌ ও পটাসে পুষ্ট। উপকূলের লোণাজল হইতে **লবণ** প্রস্তুত করা হয়। এখানকার সমভূমি ব্রহ্মপুত্র নদ ও গঙ্গানদী বাহিত পলল মৃত্তিকা দিয়া গড়া। এই দুই নদীর মৃত্তিকায় সামান্য পার্থক্য আছে।

জলবায়ুঃ এই অঞ্চলের জলবায়ু সাধারণতঃ উষ্ণ ও আর্দ্র। কর্কটক্রান্তি নামক কাল্পনিক অক্ষরেখাটি এই অঞ্চলের ঠিক মধ্য দিয়া নামিয়া কিছুটা দক্ষিণ দিক চাপিয়া গিয়াছে। ভূ-ভাগটি সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে সামান্য উচ্চ এবং সমুদ্রতীরবর্তী বলিয়া এই অঞ্চলে শীত ও গ্রীষ্মে তাপের পার্থক্য মাত্র ১০/১১ ডিগ্রী। সুতরাং জলবায়ু কিছুটা সমভাবাপন্ন বলা যাইতে পারে। শীতকালে বায়ু কিছুটা শুষ্ক থাকে। গ্রীষ্মকালে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে এই অঞ্চলে বৃষ্টিপাত হয়। শীতকালে শুষ্ক উত্তর-পূর্ব মৌসুমী বায়ুতে সাধারণতঃ বৃষ্টিপাত হয় না।

দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ু প্রবাহিত হইয়া উত্তর-পূর্বদিকে প্রথমে মেঘালয়ে প্রবেশ করিয়া খাসিয়া পাহাড়ের বনভূমিতে ঘনীভূত হয়। তারপর এই বাতাস বাঁকিয়া পশ্চিমদিকে যাইতে আরম্ভ করে। এইজন্য এই অঞ্চলে বাংলাদেশ অপেক্ষা কম বৃষ্টিপাত হয়। কলিকাতায় ১৬০ সে. মি. বৃষ্টিপাত হয়। বাংলাদেশের ঢাকায় ২২৫ সে. মি. ও শ্রীহট্টে ৪০৬'৪ সে. মি. বৃষ্টিপাত হয়। গঙ্গার নিম্নগতি অঞ্চলের পশ্চিমভাগে বায়ু কিছু কম আর্দ্র বলিয়া বীরভূম, বাঁকুড়া ও পুরুলিয়া জিলাত্রয় অধিকতর স্বাস্থ্যকর।

গ্রীষ্মকালে মৌসুমীবায়ুর প্রারম্ভে এই অঞ্চলে অপরাহ্নে প্রায়ই ঝড় তুফান হয়। ঐ ঝড়ো বাতাসের প্রচলিত নাম **কালবৈশাখী**। মৌসুমী-শেষে **আশ্বিনের ঝড়** মাঝে মাঝে বহে।

উদ্ভিদ ও জীবজন্তুঃ উপকূলের বনভূমি '**সুন্দরবন**' নামে খ্যাত। এখানকার প্রাকৃতিক অবস্থায় সুন্দরী, গরান, কেয়া ও গেঁউয়া প্রভৃতি বহু বৃক্ষ জন্মে। উহাদের মধ্যে অনেকগুলি বৃক্ষের কাঠ শক্ত। ঐ কাঠ দিয়া আসবাবপত্র, ঘরের খুটি ও তক্তা প্রস্তুত হয়। গেঁউয়া নামক বৃক্ষটি উপকূলের তটভূমিতে জন্মে। উহার কাঠ নরম।

উহা দ্বারা প্যাকিং বাক্স এবং দিয়াশলাই-এর কাঠি ও বাক্স প্রস্তুত হয়। এখানকার হোগলা এক প্রকার জলজ উদ্ভিদ। উপকূলে তটভূমির বৃক্ষগুলির মধ্যে অনেকগুলি ম্যানগ্রোভ জাতীয়। সুন্দরবনে ভূভাগে ব্যাঘ্র, শূকর ও হরিণ প্রভৃতি বন্য জন্তু এবং নদীনালায় কুমীর, হাঙ্গর ও বিষধর সর্প দেখা যায়।

সমভূমি অঞ্চলে আম, কাঁঠাল, মেহগনি, নিম ও তেঁতুল প্রভৃতি বৃক্ষ এবং বাঁশ ও বেত প্রচুর জন্মে। স্থানীয় আম, জাম ও কাঁঠাল প্রভৃতি সুস্বাদু ফলগুলি খাদ্য হিসাবে উপাদেয়। এই সকল বৃক্ষের কাষ্ঠ এবং বাঁশ ও বেত প্রভৃতি উদ্ভিজ্জ নানা ভাবে মনুষ্যহিতকর কাজে ব্যবহৃত হয়। বর্তমানে বাঁশের মণ্ড দিয়া কাগজ প্রস্তুত হয়। নদীতীরে সমুদ্র উপকূলে নারিকেল, সুপারী, খেজুর ও তালগাছ অধিক দেখা যায়। এই সকল বৃক্ষ নানাভাবে মানুষের উপকারে আসে।

পশ্চিমদিকে **মালভূমির অভিক্ষেপ** অঞ্চলে মহুয়া, কেঁদ, শিমুল ও অর্জুন প্রভৃতি গাছ অধিক। শিমুল তুলা বালিশ ও তোষক ইত্যাদি প্রস্তুতে ব্যবহৃত হয়। দিয়াশলাই প্রস্তুতে শিমুল কাঠ ব্যবহার করা হয়। অঞ্চলটিতে আসবাবপত্রের কাঠ, মধু, জ্বালানি কাঠ, খয়ের ও বাঁশ প্রচুর পাওয়া যায়।

খনিজ সম্পদ ঃ এই অঞ্চলের বর্ধমান জিলার রাণীগঞ্জে ও আসানসোলে উৎকৃষ্ট কয়লা প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। আসানসোল ও রাণীগঞ্জের নিকট প্রায় ১৩০০ বর্গ কিলোমিটার স্থানে উৎকৃষ্ট কয়লার খনি আছে। কয়লাখনির সংখ্যা প্রায় দুই শতাধিক। বর্ধমান বিভাগের পশ্চিম সীমানায় খনিজ লৌহ, কেওলীন বা মিহি চীনামাটি, বালি বা সিলিকা ও চুনাপাথর প্রভৃতি খনিতে পাওয়া যায়। পুরুলিয়া জিলায় এই সকল খনিজ সম্পদের আকর পাওয়া গিয়াছে। সেখানে খনিজ সম্পদ উদ্ধারের ব্যবস্থা চলিতেছে।

অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিবেশ—

অধিবাসী ঃ ভারতীয় প্রজাতন্ত্রে অবস্থিত গঙ্গার নিম্নগতি অঞ্চল পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের চার-পঞ্চমাংশ স্থান ব্যাপিয়া বিদ্যমান। এইখানকার লোকবসতি বেশ ঘন। আঞ্চলিক কৃষি, শ্রমশিল্প ও যোগাযোগ ব্যবস্থা জীবিকা অর্জনের সুযোগ দেয়। ফলে সারা বৎসর ধরিয়া সন্নিকটস্থ রাজ্য হইতে বহু লোকের সমাগম চলে। আঞ্চলিক মৌসুমী জলবায়ু ও অনুকূল পরিবেশ স্থায়ী লোকবসতির সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়াছে।

কলিকাতা পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের রাজধানী ও বন্দর। কলিকাতা ও কলিকাতার শহরতলী শিল্প-কারখানায় উন্নত। উহার যোগাযোগ ব্যবস্থা আধুনিক। এখানে কর্মসংস্থান নানা ধরণের। হুগলী নদীর উভয়তীরে কলিকাতার চারিপাশে বহু লোক বসবাস করায় জমির উপর অধিক চাপ পড়িয়াছে ও কৃষির পোষণ ক্ষমতার সীমা

ছাড়াইয়া গিয়াছে। কৃষিভূমিতে শিল্প কারখানা স্থাপিত হইতেছে। এইরকম **দুর্গাপুর-আসানসোল** অঞ্চলে এবং **খড়গপুর-মেদিনীপুর** অঞ্চলে বহু লোকের বাস।

আঞ্চলিক লোকবসতির ঘনত্ব প্রতি বর্গ কিলোমিটারে ৫৯০ জনের অধিক। অধিবাসীদের ৭৫ শতাংশ গ্রামবাসী। শিক্ষিতের হার ৩৩ শতাংশ। পুরুষ শিক্ষিত ৪২ শতাংশ এবং মহিলা ২২ শতাংশ। নদীর নিম্নগতিতে পশ্চিমবঙ্গে শিল্পশ্রমিক ২৮ শতাংশ। উহাদের মধ্যে পুরুষ শ্রমিক ৯৫ শতাংশ এবং নারী শ্রমিক ৫ শতাংশ। অধিবাসীদের অনেকেই কৃষক। কৃষকের সংখ্যা মোট লোকসংখ্যার ৭০ শতাংশ। অন্যান্য বৃত্তিজীবীর সংখ্যা জনবলের তুলনায় নগণ্য। কৃষি উন্নয়ন ব্যবস্থা সম্পূর্ণরূপে রূপায়িত হইলে আঞ্চলিক আর্থিক অবস্থা উন্নত হইবে।

কৃষি ও জলসেচ ঃ অঞ্চলের প্রধান ফসল **ধান** ও **পাট**। নিম্ন গতিতে প্রায় ৫০ লক্ষ হেক্টার কৃষি জমিতে ধান উৎপন্ন হয় এবং পাটের জমির পরিমাণ কমপক্ষে ৫০ লক্ষ হেক্টার। গঙ্গার নিম্নগতিতে ভারতের এই অঞ্চলে আবাদী জমির আয়তন ৫৫ লক্ষ হেক্টার। ইহার ২০ শতাংশে একাধিক ফসল উৎপন্ন হয়।

আঞ্চলিক জলসেচ পরিকল্পনার মধ্যে অন্যতম হইল—**দামোদর, ময়ূরাক্ষী ও কংসাবতী নদী পরিকল্পনা**। দামোদর পরিকল্পনায় পশ্চিমবঙ্গের ৮ লক্ষ একর জমিতে জলসেচের ব্যবস্থা হয়। উহাতে গঙ্গার দক্ষিণে অবস্থিত সমভূমির পশ্চিমকূল উপকৃত হয়। দামোদর পরিকল্পনায় জলসেচের ফলে বর্ধমান, বাঁকুড়া, হুগলী ও হাওড়া জিলাগুলিতে অধিক ফসল উৎপন্ন হইতেছে। ময়ূরাক্ষী পরিকল্পনায় ২·৫ লক্ষ হেক্টার জমিতে জলসেচ করা হয়। উহাতে সমভূমির পশ্চিমাংশ বিশেষভাবে উপকৃত। বীরভূম জিলারও পশ্চিমে মালভূমির অভিক্ষেপ অঞ্চলে চাষের অবস্থা জলসেচ পরিকল্পনার সাহায্যে উন্নত হইয়াছে। কংসাবতী পরিকল্পনা এখনও সম্পূর্ণ কার্যকরী হয় নাই। পরিকল্পনাটি সম্পূর্ণ হইলে পশ্চিমবঙ্গের বাঁকুড়া জিলা বিশেষভাবে উপকৃত হইবে। কমপক্ষে ৪ লক্ষ হেক্টার জমিতে জলসেচের ব্যবস্থা হইতেছে নিম্নগতিতে আরও কয়েকটি নদীপরিকল্পনায় জল সরবরাহ করা হইবে। উহাদের মধ্যে **বন্দু**—২ হাজার হেক্টার, **বেড়াইখাল**—২ হাজার হেক্টার, **করতোয়া**—২ হাজার হেক্টার, **সাহারজোড়**—৫ হাজার হেক্টার, **হিংগোল**—১২ হাজার হেক্টার, **শুভঙ্কর**—২·৪ হাজার হেক্টার জমিতে জলসেচ করিবে। অঞ্চলটিতে জলসেচ জমির আয়তন আবাদী জমির ৪৬ শতাংশে দাঁড়াইয়াছে।

পুরুলিয়া জিলায় **লিপানিয়াজোড়** ও **গোলমারাজোড়** নামক নদীপরিকল্পনাদ্বয় কার্যকরী হইলে ১৫৮৪ হেক্টার ও ১০০৮ হেক্টার জমিতে জলসেচ হইবে। দুইটিই

দামোদর নদের উপনদী। নদীবক্ষে বাঁধ নির্মাণ করিয়া জলাধারের সৃষ্টি হইলে খালযোগে জল কৃষিজমিতে বহান হইবে। উভয় পরিকল্পনা কার্যকরী করিতে যথাক্রমে ৭৩ লক্ষ টাকা ও ৫২ লক্ষ টাকা খরচ বাবদ ধার্য হইয়াছে।

ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের ধান উৎপাদন স্থানগুলির মধ্যে গঙ্গার নিম্নগতি অঞ্চলের স্থান সর্ব প্রথম। রাষ্ট্রের এই ব-দ্বীপ অঞ্চলে সর্বাধিক ধান উৎপন্ন হয়। আবাদী জমির ৭০ শতাংশে **ধান** উৎপন্ন হয়। অঞ্চলটিতে **গম, যব, ভুট্টা, ছোলা** ও **মটর** উৎপন্ন হয়। বাণিজ্যিক ফসলের মধ্যে অন্যতম হইল—**পাট, চা** ও **পান**। এই অঞ্চলটির সামান্য জমিতে **তৈলবীজ, তামাক** এবং **ইক্ষু** উৎপন্ন হয়। বর্তমানে এই অঞ্চলে ৭৪·২ লক্ষ টন খাদ্যশস্য, ৫০ হাজার টন তৈলবীজ, ১·৫ লক্ষ টন আখের গুড় ও ২৭ লক্ষ বেল পাট উৎপন্ন হয়। খাদ্যশস্যের মধ্যে চাউলের গড় উৎপাদন ৬৩·৫ লক্ষ টন। অঞ্চলটিতে প্রচুর ধান উৎপন্ন হইলেও লোকসংখ্যা অধিক থাকায় চাউলের চাহিদা অত্যধিক। চাহিদা মিটাইবার জন্য চাউল সন্নিহিত রাজ্য হইতে আমদানি করিতে হয়। চা ও পাটজাত সামগ্রী রপ্তানী করিয়া অঞ্চলটি ভারত যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে সর্বাধিক বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে।

বিদ্যুৎ: **দামোদর** ও **ময়ূরাক্ষী** নদী পরিকল্পনার উৎপাদিত জলবিদ্যুৎ ও তাপ-বিদ্যুতের অনেকটা পশ্চিমবঙ্গে সরবরাহ করা হয়। ইহা ছাড়া **কলিকাতা ইলেকট্রিক সাপ্লাই করপোরেশন** নিজ উৎপাদনকেন্দ্রে তাপ-বিদ্যুৎ উৎপাদন করে। **সাঁওতালদিহি তাপ-বিদ্যুৎ** পরিকল্পনার প্রথম কেন্দ্রটি হইতে বিদ্যুৎ পরিবেশিত হইতেছে। **ব্যাণ্ডেল** ও **দুর্গাপুর** তাপবিদ্যুৎকেন্দ্রে প্রায় ৬০৫ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হয়। পশ্চিমবঙ্গের উত্তর ভাগে স্থানীয় **জলঢাকা** জল-বিদ্যুৎ-কেন্দ্রে বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়। এই অঞ্চলে ৩৩২৮টি গ্রামে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হয়।

শ্রমশিল্প: গঙ্গার নিম্নগতি অঞ্চলটি **বৃহৎ** ও **মাঝারি** যন্ত্রশিল্প এবং **কুটীর** শিল্পে বেশ উন্নত। অঞ্চলটিতে কয়েকটি শিল্পগোষ্ঠী রচিত হইয়াছে। যথা: (১) **কলিকাতা ও কলিকাতার শহরতলী শিল্পগোষ্ঠী:** হুগলী নদীর উত্তর তীরে কলিকাতা হইতে উত্তরে ও দক্ষিণে ৪৫ কিলোমিটার দূরত্ব পর্যন্ত। (২) দামোদর-অজয় দোয়াবে **আসানসোল—দুর্গাপুর শিল্পগোষ্ঠী** (৩) **খড়্গপুর মেদিনীপুর শিল্পগোষ্ঠী** ও (৪) **জলপাইগুড়ি-শিলিগুড়ি কোচবিহার শিল্পগোষ্ঠী**। ইহা ছাড়া কুটীর-শিল্প প্রায় সব জিলাতেই প্রসার লাভ করিয়াছে।

(১) **কলিকাতা ও কলিকাতার শহরতলী শিল্পগোষ্ঠীতে** পাটকল, কাপড়কল, কাগজকল, ইস্পাত কারখানা, রবার কারখানা, অস্ত্রশস্ত্রের কারখানা, এ্যালুমিনিয়াম কারখানা, মোটরগাড়ীর কারখানা, রসায়নশিল্প কারখানা, এনামেল

কারখানা, পেন্সিল ও কলম ইত্যাদি তৈয়ারি করিবার কারখানা, চীনামাটির বাসনের কারখানা, সিগারেট, দিয়াশলাই ও মোমবাতি তৈয়ারি করিবার কারখানা এবং মৃৎশিল্প ও মুদ্রণ শিল্প প্রভৃতি গড়িয়া উঠিয়াছে। কলিকাতার অদূরে বাটানগরে অতি বৃহৎ জুতার কারখানা বিদ্যমান।

(২) **দামোদর-অজয় দোয়াবে আসানসোল-দুর্গাপুর শিল্পগণ্ডীতে** আকরিক লৌহ, চুনাপাথর ও কয়লার খনি বিদ্যমান থাকায় এই অঞ্চলটি লৌহদ্রব্য উৎপাদনের এবং অন্যান্য বৃহৎশিল্প কারখানার উপযুক্ত স্থান। এই অঞ্চলের আসানসোল, চিত্তরঞ্জন, কুলটি, বার্নপুর ও দুর্গাপুর প্রভৃতি স্থানে রেলইঞ্জিন মেরামত ও তৈরির কারখানা, লৌহ ও ইস্পাত কারখানা, বৈদ্যুতিক তার তৈরির কারখানা, এ্যালুমিনিয়াম কারখানা, নানারকম যন্ত্রপাতি প্রস্তুত করার কারখানা, কোকচুল্লী, কয়লা হইতে গ্যাস উৎপাদনের কারখানা ও কাঁচের কারখানা প্রভৃতি বৃহৎ শিল্প-কারখানাগুলি চালু রহিয়াছে।

(৩) **খড়গপুর-মেদিনীপুর শিল্পগণ্ডীতে** রেলগাড়ী মেরামত কারখানা ও ধানকল প্রধান।

(৪) **জলপাইগুড়ি-শিলিগুড়ি-কোচবিহার শিল্পগণ্ডীতে** চা-শিল্প, কাঠচিরাই কল ও ধানকল প্রধান।

বর্তমানে কল্যাণী ও হলদিয়া নামক দুইটি স্থান শিল্পকেন্দ্রে রূপায়িত হইতেছে। কল্যাণীর **সূতা প্রস্তুত কারখানা** সরকারী পরিচালনাধীন। অদূরে হরিণঘাটায় **সরকারী দুগ্ধকেন্দ্র** স্থাপিত। হলদিয়া বন্দরের অনতিদূরে **সার তৈরির কারখানা ও খনিজ তৈলশোধন কারখানা** নির্মিত হইতেছে। হলদিয়ায় কারখানাগুলির অধিকাংশই সরকারী সংস্থার অন্তর্গত। এই অঞ্চলে বেসরকারী শিল্প কারখানার সংখ্যাও কালক্রমে বৃদ্ধি পাইবে।

কুটীরশিল্পের মধ্যে ভাগীরথী হুগলী নদী পর্যঙ্কে নদীয়া, হুগলী ও বীরভূম প্রভৃতি জিলায় **তাঁত শিল্প**; মুর্শিদাবাদ, বাঁকুড়া ও পুরুলিয়া জিলায় **রেশম শিল্প**; মুর্শিদাবাদ ও কলিকাতায় **পিতল কাঁসার বাসন** প্রভৃতি শিল্প প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। ইহা ছাড়া কলিকাতা ও নদীয়া জিলা **মৃৎশিল্পে** ও **শাঁখের জিনিস** প্রস্তুতের কাজে প্রসিদ্ধ; কলিকাতা ও হুগলী জিলায় **গেঞ্জি, ছাতার বাট** ও **সাবান** প্রস্তুতের অনেক কারখানা আছে। নিম্ন গাঙ্গেয় সমভূমি অঞ্চলের অধিবাসীদের মধ্যে শতকরা ২০ জন শিল্পশ্রমিক।

পরিবহণ ও বাণিজ্য ঃ অঞ্চলটিতে স্থলপথ, জলপথ ও বিমানপথের গুরুত্ব অপরিসীম। **স্থলপথে** রাজপথ ও রেলপথ সামগ্রী সরবরাহে যথেষ্ট সাহায্য করে।

অঞ্চলটিতে ৬০ হাজার কিলোমিটার রাজপথের মধ্যে ৪০ হাজার কিলোমিটার রাজপথ কাঁচা এবং ২০ হাজার কিলোমিটার রাজপথ পাকা। পাকা জাতীয় সড়কের দৈর্ঘ্য ১.৫ হাজার কিলোমিটার। অঞ্চলটিতে রাজ্য সড়ক ও গ্রামীণ সড়ক বিদ্যমান। রাজপথে মোটরগাড়ী অধিক চলাফেরা করে।

রেলপথে শিয়ালদহ ও হাওড়া দুইটি বিশিষ্ট প্রান্ত ষ্টেশন। পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব রেলপথের উহারা প্রান্ত ষ্টেশন। উভয় রেলপথ ব্রডগেজ। অঞ্চলটির উত্তরভাগে সামান্য অংশের উপর দিয়া উত্তর-পূর্ব রেলপথ চলিয়া গিয়াছে। ফারাক্কা সেতু গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্র পর্যঙ্কের উভয় সমভূমিকে যুক্ত করে। সেতুর উপর রাজপথ ও রেলপথ বিদ্যমান থাকায় পূর্বাঞ্চলের সহিত যোগাযোগ স্থাপনের সুবিধা হইয়াছে। রেলপথগুলি রাষ্ট্রের অন্যান্য রাজ্যের সহিত যোগাযোগ রক্ষা করিতেছে।

আঞ্চলিক নদী, উপনদী ও শাখানদীগুলি নাব্য। নদীপথে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে যাতায়াত করা যায়। নদীপথে এই অঞ্চল হইতে ভারতের অন্যত্র যেমন যাওয়া যায়, তেমনি প্রতিবেশী রাষ্ট্র বাংলাদেশেও যাত্রী যাতায়াত করে ও পণ্যদ্রব্য স্থানান্তরিত করা হয়। **কলিকাতা** সমুদ্রপথে প্রসিদ্ধ বন্দর। **হলদিয়া** বন্দর শীঘ্রই পণ্যসামগ্রী আমদানি-রপ্তানি করিবে।

বিমানপথে **দমদম** আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর। দেশের ও বিদেশের বিমান পোতসমূহ এখানে উঠা-নামা করে। ভারতের বড় বড় শহর ও নগর বিমানপথে দমদম বিমানবন্দরের সহিত যুক্ত। দমদম হইতে বিমানপথে পৃথিবীর বিভিন্ন রাষ্ট্রে যাওয়া যায়। অঞ্চলটিতে আরও কয়েকটি বিমানঘাটি রহিয়াছে। উহারা হইল—**পানাগড়, ব্যারাকপুর, বেহালা, বাগডোগরা, খড়গপুর, বালুরঘাট, কোচবিহার, মালদহ** ও জলপাইগুড়িতে **আমবাড়ী** নামক স্থানে।

এই অঞ্চলের **রপ্তানী** সামগ্রী বলিতে চা, পাটজাত সামগ্রী, কুটীরশিল্পজাত সামগ্রী, ইস্পাত সামগ্রী ও যানবাহন প্রভৃতি প্রধান। কয়লা ও খনিজ লৌহ কলিকাতা বন্দর দিয়া রপ্তানি হয়। অঞ্চলটি খাদ্যশস্য, যন্ত্রপাতি, সার, চিনি, বস্ত্র, তৈলবীজ, তুলা, পাট ও ঔষধ **আমদানি** করে।

প্রসিদ্ধ স্থানঃ কলিকাতা—পশ্চিমবঙ্গের রাজধানী। শহরটিতে লোকসংখ্যা ৩২ লক্ষ, উপকণ্ঠ সহ শহরে ৭০ লক্ষ অধিবাসী বাস করে। সমুদ্র হইতে ১২৮ কি.মি. দূরে হুগলী নদীর পূর্বতীরে অবস্থিত এই শহরটি ভারতের **শ্রেষ্ঠ নগর ও দ্বিতীয় বন্দর** এবং পূর্ব ভারতের প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্র। ইহা রেলপথের একটি কেন্দ্র। কলিকাতার উপকণ্ঠে **দমদম** আন্তর্জাতিক বিমানপথের একটি প্রসিদ্ধ বিমানবন্দর। ভারতের রপ্তানি বাণিজ্যের প্রায় অর্ধেক **কলিকাতা বন্দর** দিয়া যায়। সমগ্র **পূর্ব**

ভারত কলিকাতা বন্দরের **পশ্চাদ্‌ভূমি**। কলিকাতার উপকণ্ঠে **খিদিরপুরে** কলিকাতা বন্দরের সুবৃহৎ পোতাশ্রয় প্রাচীন **কিং জর্জ ডক্‌** অবস্থিত। সম্প্রতি ইহার নামকরণ হইয়াছে **নেতাজী ডক**। ইহা পৃথিবীর অন্যতম বৃহৎ পোতাশ্রয় বা ডক বলিয়া পরিগণিত। **গার্ডেনরীচ ওয়ার্কশপে** জাহাজ মেরামত হয়। বর্তমানে এখানে ছোট ছোট জাহাজ নির্মিতও হইতেছে।

১৯১১ খ্রীঃ পর্যন্ত কলিকাতা ব্রিটিশ-ভারতের রাজধানী ছিল। কলিকাতার **হাইকোর্ট** অতি প্রাচীন এবং **কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়** সমগ্র ভারতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বিশ্ববিদ্যালয়। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের পৈতৃক বাসভবন জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ীতে **রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়** স্থাপিত হইয়াছে; কলিকাতার উপকণ্ঠে **যাদবপুরে** একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। যাদবপুরে কেন্দ্রীয় কাঁচ ও মৃৎশিল্প গবেষণাগার অবস্থিত। **কল্যাণীতে** কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয় ও বিধানচন্দ্র কৃষিবিশ্ববিদ্যালয় অবস্থিত।

হাওড়া—হুগলী নদীর পশ্চিমতীরে অবস্থিত শহর। হুগলীনদীর উপর নির্মিত একটি বৃহৎ সেতু, **'হাওড়া ব্রীজ'** দ্বারা ইহা কলিকাতা শহরের সহিত সংযুক্ত। ইহা রেলপথ দ্বারা ভারতের অন্যান্য শহরের সহিতও যুক্ত। ইহা পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব রেলপথের প্রান্তিক ষ্টেশন। এখানে অনেকগুলি ছোট বড় লৌহ কারখানা ও পাটের কল আছে। হাওড়া ও কলিকাতা এবং ভাগীরথী হুগলী নদীর উভয় তীরে নৈহাটী পর্যন্ত বিভিন্ন স্থানে নানা কারখানা এবং অনেকগুলি পাটের কল গড়িয়া উঠিয়াছে। হাওড়ায় শিবপুরে বোটানিক্যাল গার্ডেন ও ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ বিদ্যমান।

ডায়মণ্ডহারবার—কলিকাতা হইতে প্রায় ৪৮ কি. মি. দক্ষিণ-পূর্বে হুগলী নদীর মোহনার অনতিদূরে অবস্থিত বন্দর। ইহা কলিকাতার সহিত জলপথে, রাজপথে ও রেলপথে সংযুক্ত। মুক্তবায়ুপূর্ণ এই সুদৃশ্য স্থানটি জনাকীর্ণ কলিকাতার প্রমোদার্থী ব্যক্তিগণের অবসর সময়ে ভ্রমণের স্থান। **কল্যাণী**—চব্বিশ পরগণা জিলার উত্তরাংশে একটি নূতন উপনগরী। এখানে সাধারণ শিক্ষার বিশ্ববিদ্যালয়, কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, সুতাকল ও পশুপালন-কেন্দ্র আছে। **হলদিয়া**—মেদিনীপুর জিলায় ভাগীরথী-হুগলী নদীর পশ্চিমতীরে অবস্থিত একটি নূতন বন্দর। এখানে খনিজ তৈল শোধনাগার প্রতিষ্ঠিত হইতেছে। **দীঘা**—মেদিনীপুর জিলায় সমুদ্রোপকূলে ওড়িয়া-সীমান্ত হইতে অদূরে অবস্থিত একটি নবগঠিত স্বাস্থ্য-নিবাস। **চন্দননগর**—কলিকাতার অনতিদূরে ভাগীরথী-হুগলী নদীর দক্ষিণ তীরে অবস্থিত এই শহরটি প্রায় দুইশত বৎসরকাল ফরাসী অধিকারভুক্ত ছিল। ১৯৪৯ খ্রীঃ অধিবাসীদের গণভোটের ফলে চন্দননগর ভারত-যুক্তরাষ্ট্রের সহিত যুক্ত হয়। বর্তমানে ইহা পশ্চিমবঙ্গের হুগলী

জিলার অন্তর্গত একটি মহকুমা। হুগলী জিলার **উত্তরপাড়ার** সন্নিকটে **হিন্দ্ মোটরস্ লিঃ** নামে মোটরগাড়ী নির্মাণের এক বিরাট কারখানা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। **বোলপুর**—বীরভূম জিলায় অবস্থিত। বোলপুর রেলষ্টেশনের অনতিদূরে **শান্তিনিকেতনে** বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত **বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়** অবস্থিত। **শ্রীনিকেতন** শিল্প ও কৃষি শিক্ষার বিশিষ্ট কেন্দ্র। **নবদ্বীপ**—সংস্কৃত সাহিত্য ও ন্যায়শাস্ত্র প্রভৃতি শিক্ষার অতি প্রাচীন কেন্দ্র। ইহা শ্রীচৈতন্যদেবের জন্মস্থান ও লীলাভূমি। ইহা বৈষ্ণবদিগের তীর্থস্থান। **মুর্শিদাবাদ**—অতি প্রাচীন শহর; ইহা বাংলাদেশের শেষ স্বাধীন মুসলমান নবাবের রাজধানী। এখনও ইহা নবাবের বংশধরগণের বাসস্থান; মুর্শিদাবাদের **রেশমশিল্প** বিখ্যাত। **মালদহ**—শহর ও জিলা; উত্তম **রেশম** ও **আম্রফলের** জন্য প্রসিদ্ধ।

গাঙ্গেয় সমভূমির (ক) **উচ্চ গাঙ্গেয় সমভূমি অঞ্চলে** রহিয়াছে—উত্তর প্রদেশের কুমায়ুন, মীরাট, আগ্রা, লক্ষ্ণৌ, রোহিলাখণ্ড, এলাহাবাদ ও ফয়জাবাদ প্রভৃতি এলাকা।

(খ) **মধ্য গাঙ্গেয় সমভূমি অঞ্চলে** রহিয়াছে—উত্তর প্রদেশের গঙ্গা সমভূমির পূর্বাংশ, এলাহাবাদ ও ফয়জাবাদ মহকুমার পূর্বাংশ এবং বিহার রাজ্যে উত্তর বিহারের গঙ্গা নদীর উভয় তটস্থ অংশ।

(গ) **নিম্ন গাঙ্গেয় সমভূমি** বা **ব-দ্বীপ অঞ্চলে** রহিয়াছে—দার্জিলিং জিলার শিলিগুড়ি মহকুমা ও পুরুলিয়া জিলা ব্যতীত সমগ্র পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য এবং বিহারের পূর্ণিয়া জিলার কিয়দংশ।

প্রশ্ন

১। গঙ্গা সমভূমিকে উচ্চ, মধ্য ও নিম্ন এই তিনটি অঞ্চলে ভাগ করার কারণ কি? উচ্চ গঙ্গা সমভূমির কৃষিকার্য বর্ণনা কর।

২। গঙ্গা সমভূমির নদীবিন্যাস বর্ণনা কর। এই সমভূমির সব জল বঙ্গোপসাগরে যায় কেন?

৩। ভাঙ্গর অঞ্চলে কৃষিকার্য করা যায় না কেন? ঐ অংশের অরণ্যে কিরূপ উদ্ভিদ দেখা যায়?

৪। (ক) ভারতের কোন্ রাজ্যে সর্বাপেক্ষা বেশী চিনি উৎপন্ন হয়? ইহার কারণ কি? চারিটি চিনি উৎপাদন কেন্দ্রের অবস্থান বর্ণনা কর।

(খ) ভারতের কোন্ কোন্ রাজ্যে মৎস্যের চাহিদা অধিক? (মা. প. ১৯৭৬)

৫। তরাই অঞ্চলের ভূমিরূপ, জলবায়ু ও উদ্ভিদ বর্ণনা কর।

৬। ভাঙ্গর ও খাদর ভূমির পার্থক্য কি? উহাদের কোনটি কৃষির জন্য অধিক উপযুক্ত? উচ্চ ও মধ্যগঙ্গা সমভূমির মধ্যে কোনটিতে খাদর ভূমি বেশী আছে?

৭। পৃথিবীর বৃহত্তম ব-দ্বীপ কোন্‌টি? ঐ স্থানের ভূগঠন ও নদনদী বর্ণনা কর।

৮। উচ্চগঙ্গা সমভূমিতে প্রধান খাদ্যশস্য গম কিন্তু নিম্নগঙ্গা সমভূমিতে ধান। এরূপ হইবার কারণ কি?

৯। উচ্চগঙ্গা সমভূমিতে শিল্পের জন্য জলবিদ্যুৎ অত্যাবশ্যক কেন? ঐ অঞ্চলে বিদ্যুৎ সরবরাহকারী দুইটি প্রধান জলবিদ্যুৎকেন্দ্রের বর্ণনা কর।

১০। নিম্নলিখিত শিল্পকেন্দ্রগুলির অবস্থান ও শিল্পপ্রচেষ্টা বর্ণনা কর:

কানপুর, ডালমিয়ানগর, আগ্রা, মোরাদাবাদ, গোরখপুর, দিল্লী।

১১। পশ্চিমবঙ্গে চারটি শিল্পাঞ্চল গড়িয়া ওঠার ভৌগোলিক কারণ বর্ণনা কর।

১২। ভৌগোলিক কারণ নির্দেশ কর।

(ক) উত্তর প্রদেশের কৃষিকার্য সেচনির্ভর। (খ) উত্তর বিহারে প্রচুর মাছের চাষ হয়। (গ) ডালমিয়ানগরে সিমেণ্ট কারখানা আছে। (ঘ) উত্তর প্রদেশে ভারী শিল্পকারখানার অভাব আছে। (ঙ) উত্তর প্রদেশে বহু কাপড়ের কল আছে। (চ) কলিকাতা বন্দর চা রপ্তানী করে। (ছ) গঙ্গা সমভূমিতে বহু প্রশস্ত রাজপথ আছে। (জ) ফারাক্কায় গঙ্গার উপর একটি আড়বাঁধ (ব্যারেজ) নির্মিত হইয়াছে। (ঝ) হলদিয়ায় একটি নূতন বন্দর স্থাপিত হইয়াছে। (ঞ) গঙ্গা সমভূমির তিনটি অংশের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে বসতির ঘনত্ব সর্বাধিক। (ট) রাজগীরে বহু লোক ভ্রমণ করিতে যায়। (ঠ) কুশী নদীতে বন্যা প্রবল। (ড) মুঙ্গেরে অভ্রের কারখানা আছে। (ঢ) গঙ্গাসমভূমির পশ্চিমাংশে শীত গ্রীষ্মের তীব্রতা অত্যধিক।

১৩। নিম্ন গাঙ্গেয় সমভূমির কৃষিজ দ্রব্য কি কি? ঐ স্থানে কৃষিজাত দ্রব্যের উপর ভিত্তি করিয়া যে প্রধান শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহাদের দুইটির নাম লিখ। (মা. প. ১৯৭৬)

১৪। হলদিয়া বন্দর তৈরী হইলে কলিকাতার কি সুবিধা হইবে? (মা. প. ১৯৭৬) কলিকাতা বন্দরের ভৌগোলিক বিবরণ লিখ।

১৫। প্রাকৃতিক শক্তির উৎস কি কি? পশ্চিমবঙ্গে তাপবিদ্যুৎ উৎপাদন কোথায় কোথায় হয়? (মা. প. ১৯৭৬)

তৃতীয় পাঠ

মরুভূমি অঞ্চল

প্রাকৃতিক পরিবেশ—

অবস্থান ও ভূ-প্রকৃতিঃ উত্তর ভারতের দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত মরুভূমি অঞ্চলটি উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের শিলাস্তরের সংযোগস্থল। এই অঞ্চলটি সমগ্র রাজস্থান রাজ্য লইয়া গঠিত। অল্প বৃষ্টিপাত হেতু অঞ্চলটি খরাপীড়িত। এই অঞ্চলের উত্তর-পশ্চিমের ভূ-ভাগ মরুভূমি। অঞ্চলটি ২৩° উঃ—৩০° উঃ অক্ষাংশের এবং ৬৯° ৩০° পূঃ—৭৮° পূঃ দ্রাঘিমাংশের মধ্যে অবস্থিত। ইহা গঙ্গা সমভূমির দক্ষিণ-পশ্চিমে বিদ্যমান।
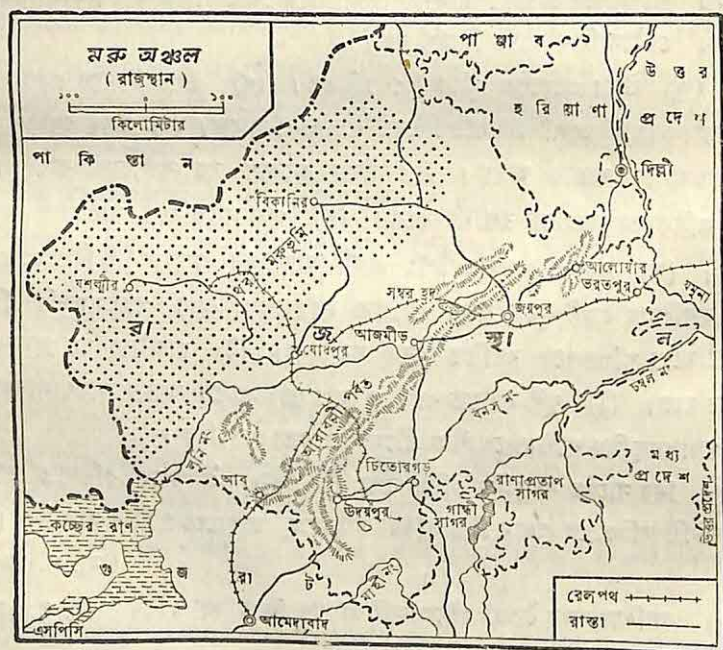
রাজস্থানের মধ্যভাগে **আরাবল্লী পর্বতশ্রেণী** উত্তর-পূর্ব হইতে দক্ষিণ-পশ্চিমে বিস্তৃত। এই পর্বতশ্রেণীর উত্তর-পশ্চিম অঞ্চল অল্প বৃষ্টিপাত হেতু খরাপীড়িত। ইহা অত্যন্ত শুষ্ক এবং ক্রমশঃ ঢালু হইয়া পাকিস্তানের সিন্ধু উপত্যকা ও হরিয়ানা-পাঞ্জাবের সমতল ভূভাগের দিকে প্রসারিত হইয়াছে। আরাবল্লী পর্বতশ্রেণীর পশ্চিমের এবং পাঞ্জাব-হরিয়ানার দক্ষিণ-পশ্চিমের বিশাল ভূ-ভাগই **থর মরুভুমি**। ইহা বালুকাময়

ও অনাবাদী; ইহাতে মধ্যে মধ্যে নগ্ন প্রস্তরময় পাহাড় ও জলশূন্য উপত্যকা বিদ্যমান। ভূভাগটি প্রায় সম্পূর্ণভাবে অনাবৃত অর্থাৎ তৃণ-লতাদিশূন্য। মধ্যে মধ্যে কোন কোন স্থানে অল্প গুল্ম অথবা স্ফীতকাণ্ডযুক্ত চারাগাছ দেখিতে পাওয়া যায়।

বৃষ্টিপাত সাধারণতঃ ২৫·৪ সে. মিটারের চেয়ে কম। বৃষ্টিপাত অত্যন্ত অনিয়মিত এবং প্রধানতঃ ঝড়ের সময়ই বর্ষণ হয়। যদিও সমৃদ্ধ সিন্ধু উপত্যকার চেয়ে এই অঞ্চলে বারিপাত বেশী হয়, তথাপি এই ভূখণ্ড এক মরুভূমি রূপেই বিদ্যমান। কারণ জলসেচ ব্যবস্থায় ব্যবহার করার মত কোন বড় নদী এই ভূভাগে নাই।

এই মরু অঞ্চল প্রায় **জনবসতিশূন্য**। যেখানে সামান্য জল পাওয়া যায়, সেখানে একটি গ্রাম গড়িয়া উঠে এবং সেখানে সামান্য জোয়ার উৎপাদন করা হয়। আবার যখনই জলের অভাব দেখা দেয়, তখনই গ্রামটি পরিত্যক্ত হয়। এই অঞ্চলের লোকেরা **উট** পালন করে, উটের দুধ পান করে এবং উহাদের সাহায্যে মরুভূমির মধ্য দিয়া যাতায়াত করে ও ব্যবসা চালায়।

উষ্ট্রপৃষ্ঠে পরিচালিত বাণিজ্যপথগুলির কেন্দ্রস্থলে **জয়শলমীর** শহর অবস্থিত। **বিকানীর** শহর উটের লোম ও কার্পাস হইতে প্রস্তুত দ্রব্যের জন্য বিখ্যাত। এই মরুভূমি মনুষ্য গমনাগমনের বিশেষ বাধাস্বরূপ।

এই অঞ্চলের দক্ষিণ-পূর্ব ভূভাগের অনেক অংশ মালভূমি হইলেও উহা কৃষিকার্যের উপযোগী। উহার মধ্য দিয়া যমুনার **চম্বল** ও চম্বলের উপনদী **বানস্** (Banas) প্রবাহিত। এই অঞ্চলের সহিত দাক্ষিণাত্য মালভূমির উত্তর ভূভাগের শিলাস্তরের কিছুটা মিল আছে। এখানকার শিলাস্তর খনিজ সামগ্রীতে পূর্ণ। অঞ্চলটির পূর্ব ভাগের ঢাল উত্তর-পূর্বদিকে। সেখানে চম্বল নদী ও উপনদীগুলি প্রবাহিত। দক্ষিণ-পূর্ব ভূভাগের দক্ষিণে **মাহী নদী** ও পশ্চিমে **লুনী নদী** বিদ্যমান। অঞ্চলটির আয়তন ৯·৪ লক্ষ বর্গ কিলোমিটার।

জলবায়ু: মরুভূমি অঞ্চলে গ্রীষ্মকালে তাপ প্রখর, কিন্তু শীতকালে তাপ বেশ কম। বৃষ্টিপাত সামান্য। জলবায়ু চরমভাবাপন্ন; উহা মহাদেশীয় মৌসুমী। পূর্বভাগে বারিপাত ৯৮ সে. মি. কিন্তু পশ্চিমভাগে ২৫·৫ সে. মি. বলিয়া অঞ্চলটিতে মরুভূমির জলবায়ু বিরাজিত।

উদ্ভিদ: অঞ্চলটির ১১ শতাংশ বনভূমি। অল্প বারিপাত অঞ্চলে কণ্টকবৃক্ষ অর্থাৎ **বাবলা, তেশিরা ও ফণিমনসা** অধিক। পূর্বাঞ্চলে মৌসুমীবৃক্ষের মধ্যে **নিম হরিতকী ও আমলকী** প্রধান।

খনিজ সম্পদ: মরু অঞ্চলের পূর্বভাগে মালভূমি অঞ্চলে রৌপ্য, তাম্র, সীসা ও দস্তা খনিজ অবস্থায় খনি হইতে উত্তোলিত হয়। ইহা ছাড়া অঞ্চলটিতে জিপ্সাম্,

এ্যাস্‌বেষ্টস্‌. কেওলীন ও অভ্র প্রভৃতি খনিজ সামগ্রীর এবং চুনি ও গারনেট প্রভৃতি মূল্যবান জহরতের খনি বিদ্যমান। ইহা ভিন্ন এই অঞ্চলে সম্বর হ্রদের চারিদিকে **করকচ লবণ** আহরণ করা হয়।

অর্থ নৈতিক ও সামাজিক পরিবেশ—

অধিবাসী ঃ মরু অঞ্চলের চারিপাশে মরুবৎ অঞ্চলে প্রায় ২·৬ কোটি লোক বাস করে। লোকবসতির ঘনত্ব প্রতি বর্গ কিলোমিটারে ৭৫ জনের কম। অঞ্চলটি বহুদিন যাবৎ অবহেলিত থাকায় খনিজ সম্পদের সন্ধান করা হয় নাই। জীবনধারণের সামগ্রী এই অঞ্চলে অল্প। এই কারণে লোকবসতি হয় নাই। বর্তমানে জলসেচ পরিকল্পনা চালু হওয়াতেই এই মরুবৎ অঞ্চল শস্য-শ্যামল হইয়া উঠিতেছে।

গৃহপালিত প্রাণী ও প্রাণিজ সামগ্রী ঃ অঞ্চলটিতে গবাদি পশু পালিত হয়। মরুবৎ অঞ্চলে গবাদি পশু বিশেষ যত্ন সহকারে পালিত হয়। অঞ্চলটিতে ১৩৫টি গবাদি পশুপালন পরিকল্পনা কার্যকরী আছে। **জয়পুর দুগ্ধ পরিকল্পনাটি** বর্তমানে ২০ হাজার লিটার **দুগ্ধ** যোগান দিতে সক্ষম। এখানকার **গাভীগুলি বৎসরে গড়ে ৩৬৩ লিটার দুগ্ধ দেয়।** রাষ্ট্রের ২৯ শতাংশ মেষ এই অঞ্চলটিতে পালিত হয়। এখানকার **পশম** উৎপাদন রাষ্ট্রের মোট উৎপাদনের ৪৫ শতাংশ।

জলসেচ ও কৃষি ঃ অঞ্চলটিতে বহু ছোট ছোট সেচ পরিকল্পনা কার্যকরী রহিয়াছে। **কোটা পরিকল্পনা ও রাণা প্রতাপ সাগর পরিকল্পনায়** অঞ্চলটির পূর্বভাগে ৩·৫ লক্ষ হেক্টার জমিতে জলসেচ সম্ভব হইয়াছে। **রাজস্থান খালটি** শতদ্রু নদীর জল লইয়া রাজস্থানের ১২ লক্ষ হেক্টার জমি সেচ করিবে। পরিকল্পনাটি পঞ্চম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় শেষ হইবার কথা। বর্তমানে **ভাক্‌রা-নাঙ্গাল পরিকল্পনায়** মরুভূমির উত্তর ভাগে ২৫ লক্ষ হেক্টার জমিতে জলসেচ সম্ভব হওয়ায় ফসল উৎপাদনের সুবিধা হইয়াছে। মোট কৃষি জমি ১৬৩ লক্ষ হেক্টার। জলসেচের মোট আবাদী জমির আয়তন ১৪৫ লক্ষ হেক্টার। অঞ্চলটিতে **গম, জোয়ার, বাজরা, ভুট্টা, ছোলা, তৈলবীজ, তামাক** ও **তুলা** উৎপন্ন হয়। **ধান** চাষের জমি সামান্য। নদী উপত্যকায় ১ লক্ষ হেক্টার জমিতে প্রায় ১·৩ লক্ষ টন চাউল উৎপন্ন হয়। বর্তমানে জলসেচ অঞ্চলে ২·২ লক্ষ হেক্টার জমিতে তূলার চাষ করিয়া দীর্ঘ আঁশের ২·৩ লক্ষ বেল তূলা উৎপন্ন হয়। প্রতি বেল তূলার ওজন ১৮০ কিলোগ্রাম।

বিদ্যুৎ ও শ্রমশিল্প ঃ অঞ্চলটিতে তাপ-বিদ্যুৎ ও জল-বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হয়। উৎপাদিত বিদ্যুতের পরিমাণ ৫১৮ মেগাওয়াট। অদূর ভবিষ্যতে উহা ৭৮৬ মেগাওয়াটে দাঁড়াইবে। অঞ্চলটিতে **জওহরসাগর বাঁধের** নিকট জলবিদ্যুৎ

উৎপাদন কেন্দ্রে প্রায় ১০০ মেগাওয়াট জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের ব্যবস্থা আছে। পরিকল্পনায় বুন্দী জিলার কোটা শহরের ২৯ কি. মি. দূরে চম্বল নদীর প্রাথমিক গতিতে বাঁধ দেওয়া হইয়াছে। বাঁধের নিকট উৎপাদন কেন্দ্রে জলবিদ্যুৎ উৎপাদন করা হইলে কোটা, জয়পুর, বুন্দী, আজমীর, নাগোর, ঝালোয়ার, সোয়াই-মাধোপুর, টঙ্ক, ভিলওয়ারা ও উদয়পুর জিলাগুলি উপকৃত হইবে। যোধপুর ও অন্যান্য শহরে তাপবিদ্যুৎ উৎপাদনকেন্দ্রে বিদ্যুৎ উৎপাদিত হয়।

অঞ্চলটির উত্তর-পূর্ব ও দক্ষিণ ভাগে বৃহৎ শ্রমশিল্প ভালভাবে চালু রহিয়াছে। **বৃহৎ শ্রমশিল্পের মধ্যে রহিয়াছে**—বয়ন শিল্প, সিমেণ্ট শিল্প, মৃৎশিল্প, রসায়ন শিল্প, সার প্রস্তুত কারখানা, মদ্য প্রস্তুত কারখানা, বৈদ্যুতিক সাজ-সরঞ্জাম প্রস্তুত কারখানা, যন্ত্রাদি প্রস্তুত কারখানা, ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প, বনস্পতি কারখানা, চিনির কল, রেলের কামরা প্রস্তুত কারখানা ও আটা কল।

ক্ষুদ্র শিল্পের মধ্যে সূতা, রং, কাঠ খোদাই, কাঠের খেলনা, চামড়ার জুতা ও ব্যাগ প্রস্তুত, কৃষি যন্ত্র, তুলট কাগজ, জলের বোতল ও তাঁতবস্ত্র প্রস্তুত প্রভৃতি শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে। অঞ্চলটিতে বৎসরে ৬৫০ লক্ষ মিটার বস্ত্র, ৪ লক্ষ কিলোগ্রাম সূতা, ১৪ লক্ষ টন সিমেণ্ট, এক লক্ষ টন লবণ, ১৯ হাজার টন চিনি, ৩২ লক্ষ টন কৃত্রিম সূতা, ২ লক্ষ টন সার ও ২২ লক্ষ লিটার স্পিরিট প্রস্তুত হয়। বর্তমানে কষ্টিক সোডা, কার্বাইড ও মোটর গাড়ীর চাকা প্রস্তুতে যে সূতার প্রয়োজন হয়, তাহা প্রস্তুত হইতেছে। তাম্র গলান ব্যবস্থা ঐ অঞ্চলে দেখা যায়।

জয়পুর, আজমীর, মাড়ওয়ার, ভিলওয়ারা, উদয়পুর, করৌলি, ঝালোয়ার, যোধপুর, বিকানীর, ভরতপুর, গঙ্গানগর ও কোটা শহর ও শহরতলীতে এই সকল শিল্পকেন্দ্র গড়িয়া উঠিয়াছে।

কুটীরশিল্পে মর্মরপ্রস্তর--সামগ্রী, পশম কার্পেট, চুমকী ও সূঁচের কাজের লেস, গহনাদি, পিতল ও কাঁসার বাসন প্রভৃতি সামগ্রী প্রস্তুত হয়।

পরিবহণ ও বাণিজ্যঃ অঞ্চলটিতে স্থলপথে পরিবহণ সাধিত হয়। **স্থলপথে**—রাজপথ ও রেলপথ উন্নত। রাজপথের মোট দৈর্ঘ্য প্রায় ৩১ হাজার কিলোমিটার। উহার মধ্যে পাকা রাস্তা ১৬ হাজার কিলোমিটার এবং কাঁচা রাস্তার দৈর্ঘ্য ১৫ হাজার কিলোমিটার। ৩১ হাজার কিলোমিটার দীর্ঘ রাজপথে ৭২ হাজার মোটরগাড়ী যাতায়াত করে।

অঞ্চলটিতে তিন প্রকার গেজের রেলপথ বিদ্যমান। উহাদের মধ্যে মিটার গেজ রেলপথের দৈর্ঘ্য সর্বাপেক্ষা অধিক। ৫৮২০ কি. মি. **মিটারগেজ**, ১৯৪ কি. মি. **ব্রডগেজ** ও **ন্যারোগেজের** দৈর্ঘ্য মাত্র ১৪৪ কি. মি.। রেলপথের মোট দৈর্ঘ্য

৬১২৮ কি. মি.। বিমানপথে অঞ্চলটিতে **যোধপুর** ও **বিকানীর** এই দুইটি বিমান-ঘাঁটি অবস্থিত।

অঞ্চলটি বাজরা, জোয়ার, তৈলবীজ, লবণ, ধাতুপদার্থ, জহরত, জিপ্সাম ও কোবাল্ট **রপ্তানী** করে। **আমদানী** দ্রব্যের মধ্যে গম, ডাল, বস্ত্র, ঔষধ, যানবাহন, তৈজসপত্র ও রাসায়নিক সামগ্রী প্রধান।

প্রসিদ্ধ স্থানঃ **জয়পুর**—রাজস্থানের রাজধানী। ইহা একটি সুন্দর নগর। এই নগরের 'হাওয়া মহল', 'নগর প্রাসাদ', যাদুঘর ও 'মানমন্দির' দর্শনযোগ্য। ইহার অনতিদূরে পাহাড়ের উপর নির্মিত 'অম্বর দুর্গ' অত্যন্ত সুন্দর। **পোকরান** ও **নাগৌর** মার্বেল পাথরের জন্য বিখ্যাত। **লাখেরী** ও **সোয়াইমাধোপুরে** সিমেন্ট কারখানা আছে। **উদয়পুর**—চিতোরের প্রাচীন রাজধানী। এই নগরে অনেক উদ্যান, হ্রদ, মন্দির এবং প্রাসাদ আছে। এই নগরকে 'হ্রদ নগরী' বলা হয়। এইখানকার হ্রদমধ্যস্থ '**জলমহল**' নামক প্রাসাদ খুব সুন্দর। **চিতোরগড় দুর্গ** ও **চিতোরের বিজয়স্তম্ভ** দেখার জন্য বহু পর্যটক এখানে আসেন। এই চিতোরগড় দুর্গ ধর্মপরায়ণা মীরাবাঈ-এর পুণ্যস্মৃতি এবং পদ্মিনী ও জয়মল্লের আত্মত্যাগের স্মৃতি বিজড়িত। মাউন্ট **আবু**—ভারতের সর্বাপেক্ষা রমণীয় স্বাস্থ্যনিবাসের অন্যতম। এখানে অবস্থিত বিখ্যাত '**দিলওয়ারা মন্দির**' জৈনদিগের নিকট পবিত্র। **যোধপুর**, **জয়শলমীর**, **বিকানীর**, **আলোয়ার** এবং **ভরতপুরের** প্রাসাদ ও দুর্গসমূহও দর্শনযোগ্য। **আজমীর দরগা**—মুসলমানদের প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান। **পুষ্কর**—আজমীরের নিকটে অবস্থিত হিন্দুদের পবিত্র তীর্থস্থান।

মরুভূমি অঞ্চলটি মরু ও মরুপ্রায় ভূভাগ লইয়া গঠিত। এই অঞ্চলের মধ্যে রহিয়াছে—গঙ্গানগর, বিকানীর, নাগৌর, জালোর, বারমার, যোধপুর, জয়শলমীর ও চুরু জিলাগুলি এবং ঝুনঝুনু, পবলি ও সিকার জিলাত্রয়ের পশ্চিম ভাগ।

অনুশীলনী

১। ভারতের মরু অঞ্চলটি কোথায় অবস্থিত? এখানে মরুভূমি হইবার কারণ কি? মরু বা মরু অঞ্চলের কৃষিকার্য সম্বন্ধে আলোচনা কর।

২। মরু অঞ্চলের হ্রদগুলির অর্থনৈতিক গুরুত্ব কি? ঐরূপ একটি হ্রদের অবস্থান বর্ণনা কর।

৩। সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও—বিকানীর, জয়পুর, চুরু, পোকরান।

৪। রাজস্থানের খনিজ সম্পদের বিবরণ দাও। খনিজের উপর নির্ভর করিয়া এখানে কোন্ শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে?

৫। গঙ্গানগরকে 'রাজস্থানের শস্যভাণ্ডার' বলা হয় কেন? এখানে কোন্ কোন্ ফসল উৎপন্ন হয়?

৬। ভৌগোলিক কারণ নির্দেশ কর:

(ক) রাজস্থানে একটিও নিত্যবহ নদী নাই।

(খ) জয়শলমীরে লবণ উৎপন্ন হয়।

(গ) রাজস্থানের বাগার অঞ্চলে ব্যাপকভাবে গো-পালন করা হয়।

(ঘ) আজমীরের নিকটে বহু বালির পাহাড় আছে।

(চ) রাজস্থানে রাস্তা ও রেলপথের অভাব আছে।

৭। ভারতের একটি রেখা-মানচিত্রে মরুভূমি অঞ্চল দেখাও।

(মাধ্য. পরীক্ষা ১৯৭৬)

চতুর্থ পাঠ

কচ্ছ ও কাথিওয়াড় উপদ্বীপ

প্রাকৃতিক পরিবেশ—

অবস্থান ও ভূপ্রকৃতি: ভারতের পশ্চিমভাগে কচ্ছ নিম্নভূমি এবং কাথিওয়াড় মালভূমি ও সমভূমি বর্তমান গুজরাট রাজ্যের পশ্চিমদিকের অংশ মাত্র। অংশটি একটি উপদ্বীপ বিশেষ। এই সমভূমি অঞ্চলই পশ্চিম উপকূলের সমভূমি অঞ্চল নামে পরিচিত।

কচ্ছ ও কাথিওয়াড় অঞ্চলের উত্তরদিকে রাজস্থান রাজ্য ও পাকিস্তান, পূর্বদিকে রাজস্থান ও গুজরাট রাজ্যের পূর্বাংশ, দক্ষিণদিকে কাম্বে উপসাগর, আরব সাগর ও কচ্ছ উপসাগর এবং পশ্চিমদিকে আরব সাগর ও কচ্ছ উপসাগর অবস্থিত।

কাথিওয়াড় মালভূমির পূর্ব ও পশ্চিম পার্শ্বে নিম্ন সমভূমি বিদ্যমান। এই সমভূমি নদীমাতৃক। পূর্ব ভাগের সমভূমিটি **মাহী নদীর** নিম্নগতি দ্বারা গঠিত। উহা দাক্ষিণাত্যের কৃষ্ণ-মৃত্তিকা অঞ্চলভুক্ত; উত্তরভাগে **লুনি নদী** বিধৌত উপত্যকা কচ্ছ উপদ্বীপ রচনা করিয়াছে। কচ্ছের উত্তরভাগ বৎসরের অধিকাংশ সময় সমুদ্রজলে জলাভূমিতে পরিণত হয়। উহাকে **'কচ্ছের রাণ'** (Rann of Kutch) বলে। কচ্ছ উপদ্বীপ সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে সামান্য উচ্চতায় অবস্থিত। কচ্ছের উপকূল বা তটভূমি লবণ মিশ্রিত মৃত্তিকা দ্বারা গঠিত। কাথিওয়াড় মালভূমির শিলাস্তরের সহিত দাক্ষিণাত্য মালভূমির শিলাস্তরের সামঞ্জস্য দেখা যায়।

প্রকৃতপক্ষে কচ্ছ ও কাথিওয়াড় উপদ্বীপকে একটি স্বতন্ত্র ভৌগোলিক অঞ্চল বলা চলে না। ইহার শিলা, মৃত্তিকা, গাছপালা ও খনিজ সম্পদের সহিত দাক্ষিণাত্যের

কৃষ্ণমৃত্তিকাঞ্চলের বেশ কিছুটা সামঞ্জস্য রহিয়াছে। অপর দিকে কাথিওয়াড় আরাবল্লী পর্বতের সহিত হিমালয় ও দাক্ষিণাত্য অনেকটা একসূত্রে বদ্ধ রহিয়াছে। উপদ্বীপটি ভারত যুক্তরাষ্ট্রের পশ্চিমদিকে অবস্থিত। ইহা ২০°৩০′ উঃ—২৪°৩০′ উঃ অক্ষাংশে এবং ৬৮°৩০′ পূঃ—৭২°৯০′ পূঃ দ্রাঘিমাংশে অবস্থিত।
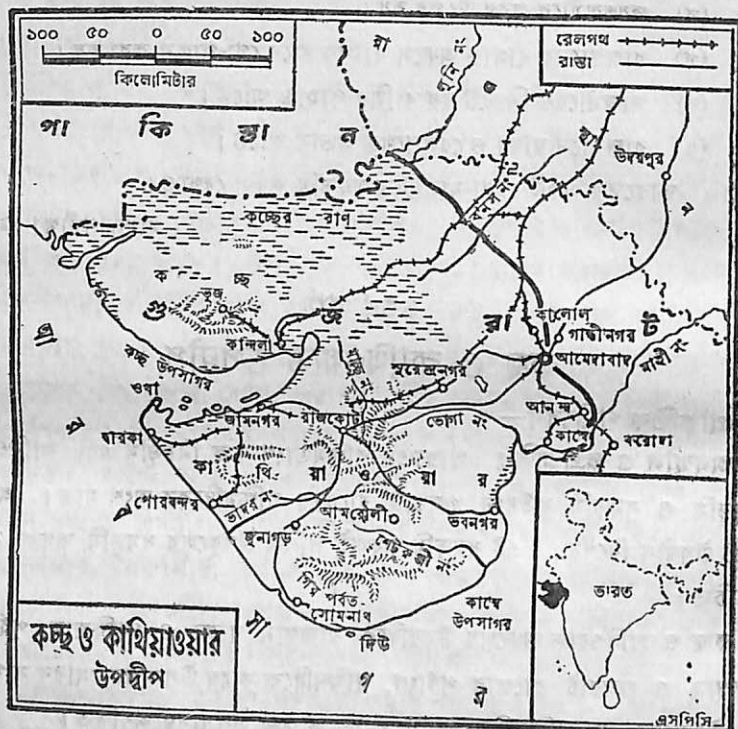
জলবায়ুঃ উপদ্বীপে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ু দ্বারা বৃষ্টিপাত হয়। বারিপাতের পরিমাণ সারা বৎসরে মাত্র ৭৪ সে. মি.। সামুদ্রিক প্রভাবে সারাবৎসর তাপের মাত্রা নাতিশীতোষ্ণ। গ্রীষ্মকালে তাপ তত প্রখর নয়। আবার শীতকালেও তাপের মাত্রা ততটা নিম্নগামী নয়।

বনজ ও খনিজ সম্পদ এবং জীবজন্তুঃ উপদ্বীপের ৯ শতাংশ ভূমি বৃক্ষাচ্ছাদিত বনভূমি। বনভূমিতে মৌসুমী বৃক্ষ সেগুন, খয়ের ও বাঁশ অধিক জন্মে। খনিজ দ্রব্যের মধ্যে ইলমেনাইট, ম্যাঙ্গানিজ, বক্সাইট ও চুনাপাথর প্রভৃতি প্রধান। কচ্ছ উপসাগরে মৎস্য পাওয়া যায়। এই রাজ্যের গিরণার পাহাড়গুলি বনে আচ্ছাদিত। এই বনগুলিকে 'গিরবন' বলা হয়। এই সকল বনে সিংহ বাস করে। ভারতের আর কোনও বনে সিংহ পাওয়া যায় না।

অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিবেশ—

অধিবাসী ঃ উপদ্বীপে প্রায় তুই কোটি লোক বাস করে। ইহাদের মধ্যে প্রায় তুই লক্ষ অধিবাসী মৎস্যজীবী। বসতির ঘনত্ব প্রতি বর্গ কিলোমিটারে ১৩৬ জন। হিন্দী ও গুজরাটী ভাষায় অধিবাসীরা কথাবার্তা বলে। ব্যবসা-বাণিজ্যে বহু লোক নিযুক্ত রহিয়াছে।

কৃষি ও পশুপালন ঃ উপদ্বীপে লাভা মিশ্রিত মৃত্তিকা বেশ উর্বর। এইকারণে ফসল উৎপাদন সম্ভব। কচ্ছ ও কাথিওয়াড়ে **তুলার** চাষ হয়। পূর্বভাগের মালভূমিতে চাষের মোট জমির অর্ধেক তুলা উৎপাদনের কাজে ব্যবহৃত হয়। এইখানকার তুলা দীর্ঘ আঁশ বিশিষ্ট। স্থানবিশেষে **গম, ধান, রাগী, জোয়ার ও বাজরা** জন্মে। চীনাবাদামের চাষ অগ্রগতির পথে। এই অঞ্চলে গবাদি পশু পালন করা হয়। **জুনাগড়, রামনগর, রাজকোট, ভবনগর ও সুরেন্দ্রনগর** নামক শহরগুলিতে আধুনিক পদ্ধতিতে তুগ্ধজাত সামগ্রী প্রস্তুত করা হয়।

শ্রমশিল্প ঃ এই অঞ্চলের কাম্বে ও কালোলের **খনিজ তৈল** শোধনের জন্য সম্প্রতি বরোদার নিকটে এক বিরাট তৈল শোধনাগার নির্মিত হইতেছে। ইহা ছাড়া কচ্ছ অঞ্চলে **ইলমেনাইট,** খনিজ **ম্যাঙ্গানিজ** ও **বক্সাইট** প্রভৃতি সামগ্রী খনি হইতে উত্তোলিত হয়। শ্রমশিল্পের মধ্যে **কাঁচ, মৃৎশিল্প** ও **সিমেণ্ট কারখানা** প্রধান। উপকূল ভাগে **লবণ** প্রস্তুত করার কার্যে বহু লোক নিযুক্ত আছে। **রেশমশিল্প** ও **কার্পাস বস্ত্র শিল্প** উপদ্বীপের নানা স্থানে দেখা যায়। কার্পাস বয়নশিল্প কারখানা কেন্দ্রীভূত হইয়াছে সর্বাপেক্ষা অধিক আহমেদাবাদে। উহার পর সুরাট, ব্রোচ, ভবনগর, পোরবন্দর, রাজকোট ও বরোদার স্থান। এই অঞ্চলে আধুনিক পদ্ধতিতে **রসায়ন দ্রব্য তৈরীর কারখানা, বনস্পতি তৈরীর কারখানা** ও **রেলের ইঞ্জিন তৈরীর কারখানা** বিদ্যমান।

পরিবহণ ও বাণিজ্য ঃ **পশ্চিম রেলপথে** গুজরাটের সুরাট ও বরোদা পার হইয়া উপদ্বীপের আহমেদাবাদ, মেহ্‌সানা, খাড়াগোধা, সুরেন্দ্রনগর, রাজকোট, নবনগর, দ্বারকা, পোরবন্দর, সোমনাথ, ভবনগর, আমরেলী, রাধানগর, কান্দলা ও ভুজ নামক শহরগুলিতে যাওয়া যায়। উপদ্বীপের মেহ্‌সানা হইতে রেলপথে রাজস্থানের মধ্য দিয়া দিল্লী যাওয়া যায়। উপদ্বীপটিতে অধিকাংশ স্থানে রেলপথ মিটার গেজের।

কচ্ছ উপসাগরে মৎস্য শিকার হয়। ধৃত মৎস্যের এক তৃতীয়াংশ স্থানীয় অধিবাসীরা খাদ্যরূপে গ্রহণ করে। অবশিষ্ট তুই-তৃতীয়াংশ অন্যত্র রপ্তানি হয়। ওখা

ও **পোরবন্দর** নামক বন্দর দুইটি হইতে মৎস্য রপ্তানি হয়। ধৃত মৎস্য বোম্বাই, ব্রহ্মদেশ, সিঙ্গাপুর, সিংহল ও কলিকাতায় রপ্তানি হয়।

বিমানপথে এই স্থানে যাত্রী যাতায়াত ও মাল চলাচল করে। **আমরেলী** একটি বিমানঘাঁটি। ভবনগর, নবনগর ও ভুজ উল্লেখযোগ্য বিমানবন্দর।

কান্দলা, ওখা ও পোরবন্দর এই উপদ্বীপের **জলপথের** বন্দর। ইহাদের মধ্যে কান্দলা বন্দরটি আধুনিক সুবিধাদি সমন্বিত বন্দররূপে সম্প্রতি স্থাপিত হইয়াছে।

উপদ্বীপ হইতে বস্ত্র, লবণ, তামাক ও চিনি অন্যত্র **রপ্তানি** হয়। **আমদানী** সামগ্রীগুলির মধ্যে খাদ্যসামগ্রী, বিলাসদ্রব্য, ঔষধ, কয়লা ও পেট্রোল ইত্যাদি প্রধান।

প্রসিদ্ধ স্থানঃ আহমেদাবাদ—বস্ত্রশিল্পের প্রধান কেন্দ্র। এই শহরকে 'ভারতের ম্যাঞ্চেষ্টার' বলা হয়। এই শহরে ১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দে গুজরাট বিশ্ববিদ্যালয় ও ১৯৬০ খ্রীষ্টাব্দে গুজরাট হাইকোর্ট প্রতিষ্ঠিত হয়। **ভুজ**—পূর্বতন কচ্ছরাজ্যের রাজধানী ছিল। **কান্দলা**—কচ্ছের একটি ক্রমবর্ধমান বন্দর। **রাজকোট**—সৌরাষ্ট্রের রাজধানী ছিল। বস্ত্রশিল্প কারখানার কেন্দ্র। **ওখা**—সৌরাষ্ট্রের একটি বৃহৎ বন্দর। **দ্বারকা**—এখানে একটি সিমেণ্ট কারখানা আছে। ইহা হিন্দুদিগের তীর্থস্থান। পৌরাণিক কাহিনী অনুসারে এখানে শ্রীকৃষ্ণের রাজধানী ছিল। অদূরে **প্রভাস** হিন্দুদিগের তীর্থস্থান। **পোরবন্দর**—মহাত্মা গান্ধীর জন্মস্থান। বস্ত্রশিল্প কারখানার কেন্দ্র। **সোমনাথ**—হিন্দুদিগের তীর্থস্থান। সোমনাথের শিবমন্দির ইতিহাস-বিখ্যাত। গজনীর সুলতান মামুদ এই বিখ্যাত শিবমন্দির ধ্বংস করিলে বরোদার মহারাণী অহল্যাবাঈ উহা পুনর্নির্মাণ করেন। ভারত স্বাধীন হওয়ার পরে দেশবরেণ্য নেতা কে. এম. মুন্সীর তত্ত্বাবধানে পুনরায় মন্দিরের সংস্কার সাধন করিয়া সৌষ্ঠব বৃদ্ধি করা হয়। এখানে সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষার কেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছে। **আনন্দ্** নামক স্থানে **'আমুল সমবায় দুগ্ধ ব্যবসা কেন্দ্র'** নামে একটি দুগ্ধ ও দুগ্ধজাত দ্রব্য উৎপাদনের কেন্দ্র আছে ইহা দুগ্ধজাত দ্রব্যের জন্য সারা ভারতে প্রসিদ্ধ। **গান্ধীনগর**—আহমেদাবাদ শহরের নিকটে সবরমতী নদীর তীরে এই নগর নির্মিত হইতেছে। ইহা গুজরাট রাজ্যের নূতন রাজধানী হইবে। এখানে মহাত্মা গান্ধীর সবরমতী আশ্রম অবস্থিত। **শত্রুঞ্জয় পাহাড়ে** অবস্থিত জৈন মন্দির বিখ্যাত।

কচ্ছ ও কাথিওয়াড় উপদ্বীপটি গুজরাট রাজ্যের আহমেদাবাদ, কায়রা, ভবনগর, আমরেলী, নাধরা (পঞ্চমহল), মেহ্সানা, সুরেন্দ্রনগর, রাজকোট, জুনাগড়, জামনগর, সুরাট, বরোদা, ব্রোচ, ভুজ (কচ্ছ), আওয়া, দিউ ও দাং লইয়া গঠিত।

অনুশীলনী

১। 'কাথিওয়াড় পূর্বে একটি দ্বীপ ছিল।' ইহা মনে করিবার কারণ কি?

২। কান্দলা বন্দরটি কোথায় অবস্থিত? এখানে এই নূতন বন্দর স্থাপনের কি প্রয়োজন ছিল?

৩। 'সোমনাথ' কোথায় অবস্থিত ও কিজন্য বিখ্যাত?

৪। কাথিয়াওয়াড় উপদ্বীপের ভূ-প্রকৃতি বর্ণনা কর। স্থানীয় জলনিকাশ ব্যবস্থার (নদ-নদীর) সহিত এই ভূপ্রকৃতির সম্পর্ক কি?

৫। মানচিত্রে গিরনার পাহাড়ের অবস্থান দেখাও। উহা কিজন্য বিখ্যাত?

৬। ওখা বন্দর অঞ্চলে কি কি শিল্প প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে? স্থানটি একটি শিল্পসমৃদ্ধ অঞ্চলে পরিণত হইবার কারণ কি?

৭। সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও :—

ভবনগর, স্বরেন্দ্রনগর, পোরবন্দর, দিউ, জয়নগর, রাজকোট, বরোদা।

৮। ভৌগোলিক কারণ নির্দেশ কর :—

(ক) কাথিওয়াড় উপদ্বীপ বস্ত্রশিল্পে উন্নত। (খ) বরোদায় একটি বৃহৎ তৈল শোধনাগার নির্মিত হইয়াছে। (গ) কাথিওয়াড় উপদ্বীপের পশ্চিমাংশে সিমেন্ট তৈরীর কারখানা আছে। (ঘ) কান্দলা বন্দর হইতে লবণ রপ্তানি হয়। (ঙ) গুজরাটের অধিকাংশ লোকের প্রধান খাদ্য মিলেট (জোয়ার, বাজরা, রাগী)।

৯। বস্ত্রশিল্পে গুজরাট কেন উন্নত? ঐ রাজ্যের দুইটি বস্ত্রশিল্পকেন্দ্রের নাম লিখ। (মা. প. ১৯৭৬)

১০। ভারতের একটি রেখা-মানচিত্রে পশ্চিম উপকূলের সমভূমি অঞ্চল দেখাও। (মা. প. ১৯৭৬)
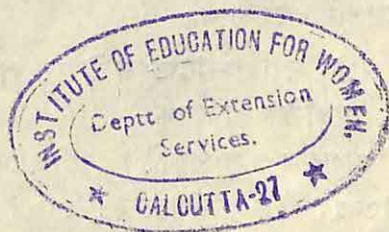
পঞ্চম পাঠ

দাক্ষিণাত্যের মালভূমি

(কৃষ্ণ মৃত্তিকা অঞ্চল, মহীশূর মালভূমি ও ছোটনাগপুর মালভূমি সহ)

সূচনা ঃ ভারত যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ ভাগ এক উপদ্বীপ বিশেষ। ইহার তিন দিকই সমুদ্র দ্বারা বেষ্টিত। উহা **দাক্ষিণাত্য বা দক্ষিণাপথ** নামে পরিচিত। দাক্ষিণাত্যের ভূ-ভাগ মালভূমি ও সমতল তটভূমির সমন্বয়। দাক্ষিণাত্যের মালভূমি অনেকটা ত্রিভুজাকার। উহার শীর্ষ দক্ষিণ প্রান্তে কন্যাকুমারী অন্তরীপে ন্যস্ত এবং ভূমি বিন্ধ্য-কাইমুর পর্বতে অবস্থিত। ত্রিভুজের দুই বাহু দুই পর্বতশিরা—পশ্চিমপার্শ্বে পশ্চিমঘাট ও পূর্বপার্শ্বে পূর্বঘাট পর্বত—বিদ্যমান। এই দুই পর্বত মালভূমির পূর্ব ও পশ্চিম সীমানা হিসাবে দণ্ডায়মান। পূর্বঘাট পর্বতটি নগ্নীভূত ও ক্ষয়িত।

উপকূলে দুইটি সমতল তটভূমি ত্রিভুজাকার মালভূমির পূর্ব ও পশ্চিমে দুই ধারে অপ্রশস্ত ভূখণ্ড লইয়া গঠিত। উহারা বেশ দীর্ঘ। উভয় উপকূল দক্ষিণে কন্যাকুমারী অন্তরীপে মিলিয়াছে। পশ্চিম ও পূর্ব উপকূলদ্বয়ের প্রত্যেকটি পুনর্বিভক্ত। পশ্চিম উপকূল **কঙ্কণ উপকূল** ও **মালাবার উপকূল** নামক দুই অংশে এবং পূর্বকূল **উত্তর সরকার** (Northern Circars) **উপকূল** ও **করমণ্ডল উপকূল** নামক দুই অংশে বিভক্ত।

দাক্ষিণাত্যের মালভূমির উত্তরভাগ পার্বত্য অঞ্চল। সমগ্র মালভূমির পর্বতশ্রেণী ও নদী-উপত্যকা চারিটি বিশেষ ভৌগোলিক অঞ্চল রচনা করিয়াছে। উত্তরভাগে (১) **দাক্ষিণাত্যের উত্তর পার্বত্য অঞ্চল,** উত্তর-পশ্চিম ভাগে (২) **লাভা** বা **কৃষ্ণমৃত্তিকা অঞ্চল,** মধ্যভাগে দাক্ষিণাত্যের (৩) **প্রকৃত মালভূমি** এবং পূর্বভাগে নদী উপত্যকার (৪) **সমভূমি অঞ্চল।** মধ্যভাগের প্রকৃত মালভূমিটির দক্ষিণ-পশ্চিমাংশ (ক) **মহীশূরের মালভূমি** ও উত্তর পূর্বাংশ (ঘ) **ছোটনাগপুরের মালভূমি** নামে খ্যাত।

(১) দাক্ষিণাত্যের উত্তর পার্বত্য অঞ্চল

প্রাকৃতিক পরিবেশ—

অবস্থান ও ভূ-প্রকৃতি ঃ দাক্ষিণাত্যের উত্তর পার্বত্য অঞ্চলের ভূ-ভাগ বন্ধুর ও পর্বতময়। ইহা দাক্ষিণাত্য উপদ্বীপের উত্তরভাগে অবস্থিত। অঞ্চলটির উত্তর দিকে উত্তর ভারতের মধ্য সমভূমি, পূর্ব দিকে দাক্ষিণাত্যের ছোটনাগপুর মালভূমি, দক্ষিণ দিকে দাক্ষিণাত্যের মহীশূর মালভূমি ও কৃষ্ণমৃত্তিকা অঞ্চল এবং পশ্চিম দিকে

দাক্ষিণাত্যের কৃষ্ণমৃত্তিকা অঞ্চল ও উত্তর ভারতের মরু অঞ্চল। এই পার্বত্য অঞ্চল মধ্য প্রদেশের মধ্যাংশ, উত্তর প্রদেশের দক্ষিণাংশ এবং বিহারের সামান্য পশ্চিমাংশ লইয়া গঠিত। বিহারের ভাবরা-সাসারাম মহকুমাদ্বয়ের কিয়দংশ ইহাতে রহিয়াছে। কেহ কেহ ইহাকে বুন্দেলখণ্ড-বিন্ধ্যাচল-বাঘেলখণ্ড মালভূমি আখ্যা দেন।
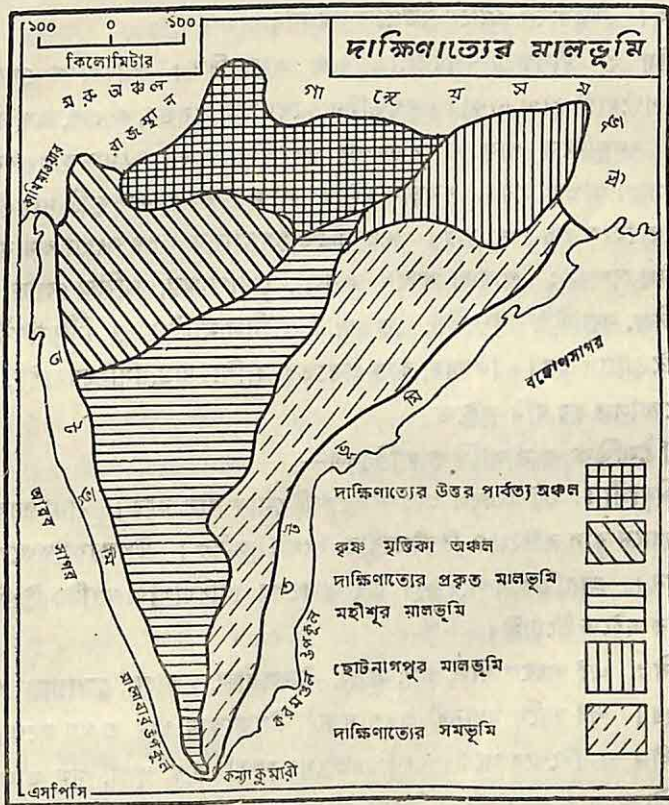
উত্তর পার্বত্য অঞ্চলে রহিয়াছে **বিন্ধ্য-কাইমুর** ও **সাতপুরা-মহাদেব-মহাকাল** নামক দুইটি পর্বতশ্রেণী। এই দুই পর্বতশ্রেণীর মধ্য দিয়া পূর্ব হইতে পশ্চিমদিকে **নর্মদা নদী** প্রবাহিত। সাতপুরা-মহাদেব-মহাকাল পর্বতের দক্ষিণ দিকে অপর এক নদী **তাপ্তী** প্রবাহিত। এই দুই পর্বতশিরা ও দুই নদীর সাধারণ ঢাল পূর্ব হইতে পশ্চিম দিকে। নদী-উপত্যকা প্রশস্ত। পশ্চিম দিকে উপত্যকাদ্বয় কৃষ্ণমৃত্তিকা দ্বারা গঠিত এবং পূর্ব দিকে মহানদী উপত্যকা পলিমাটি দিয়া গঠিত। উহারা বেশ উর্বর। এইজন্য উহারা কৃষিকার্যের খুব উপযোগী। পূর্ব ভাগে বিশেষতঃ

উচ্চ নর্মদা উপত্যকায় মার্বেল প্রস্তরের শিরা উল্লেখযোগ্য। সেখানে নর্মদাবক্ষে জলপ্রপাত থাকায় মোহনা হইতে উৎস পর্যন্ত নদীপথে যাওয়া যায় না।

জলবায়ু : অঞ্চলটিতে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বাতাসে বৃষ্টি হয়। বারিপাত অল্প। বারিপাত পূর্বদিকে অপেক্ষাকৃত অধিক এবং পশ্চিমদিকে অপেক্ষাকৃত কম। ভূভাগের উচ্চতা ও সামুদ্রিক বাতাস হেতু অঞ্চলটিতে শীত ও গ্রীষ্মের প্রকোপ ততটা তীব্র নহে। শীতকালে এখানে বৃষ্টিপাত হয় না।

উদ্ভিদ ও জীবজন্তু—পর্বতগাত্র বৃক্ষে আচ্ছাদিত। অধিকাংশ ক্ষেত্রে উহা মৌসুমী পর্ণমোচী বৃক্ষে ঢাকা। বৃক্ষগুলির মধ্যে শাল, সেগুন, জারুল, অর্জুন ও নিম প্রধান। বনভূমিতে শাল ও সেগুনকাষ্ঠ সংগৃহীত হয়। এখানকার বনভূমিতে বিড়ির পাতা পাওয়া যায়। বনভূমি হইতে **লাক্ষা** ও **রেশম-গুটি** সংগৃহীত হয়। বনভূমিতে হিংস্র পশু দেখা যায়। অঞ্চলটিতে গৃহপালিত পশুর সংখ্যা কম নহে।

খনিজ সম্পদ : পার্বত্য অঞ্চলে **কয়লা, চুণাপাথর, খনিজ লৌহ, খনিজ ম্যাঙ্গানিজ, বক্সাইট, গ্রাফাইট, কেওলীন (চীনামাটি) ও স্টিয়াটাইট** খনি হইতে উত্তোলিত হয়। জিপ্সাম, কাঁচ প্রস্তুতের বালি, অভ্র, সিলিমেনাইট, তামা ও গন্ধক উত্তোলিত হয় খনি হইতে।

অর্থ নৈতিক ও সামাজিক পরিবেশ—

অধিবাসী : এই অঞ্চলে প্রায় ২·৫ কোটি লোক বাস করে। নানা ভাষাভাষীর লোক এখানে বাস করিলেও হিন্দীভাষীর সংখ্যা অধিক। উপত্যকা অঞ্চলে লোক-বসতি ঘন। প্রাকৃতিক সম্পদে পূর্ণ এই অঞ্চলের অধিবাসীরা আর্থিক উন্নতিসাধনে নানা দিক হইতে উদ্যোগী।

কৃষি : এই অঞ্চলে **ধান, গম, তুলা, তৈলবীজ, ছোলা, জোয়ার ও রাগী** উৎপন্ন হয়। পূর্ব ভাগে মহানদী ও শোন নদী উপত্যকায় ধান ও গম জন্মে। ডাল ও তৈলবীজ স্থানবিশেষে জন্মে। পশ্চিমভাগে কৃষ্ণমৃত্তিকায় তুলা, গম, ডাল, ছোলা ও তৈলবীজের চাষ হয়। কৃষ্ণমৃত্তিকায় বিশেষতঃ জলসেচ জমিতে তুলা সর্বাধিক উৎপন্ন হয়। খরা অঞ্চলে জোয়ার, বাজরা ও রাগী উৎপন্ন হয়। অঞ্চলটিতে কমলালেবুর উপবন রহিয়াছে।

বিদ্যুৎ : **কোর্বা** তাপবিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র **পথেরখেদা** তাপবিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র ও **গওয়া** জলবিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র হইতে অঞ্চলটিতে জলবিদ্যুৎ ও তাপবিদ্যুৎ পরিবেশিত হয়।

শিল্প : **ভুপালে** বয়নশিল্প, চিনির কল ও রসায়ন শিল্প প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। নেপানগরে সংবাদপত্রের কাগজ প্রস্তুত হয়। **গওয়া ও এডাতে**

রেশম শিল্পের কারখানা আছে। **কাটনীর** সিমেন্ট শিল্প, **জব্বলপুর** ও **শাদোলের** মৃৎশিল্প, এ্যাসবেষ্টস শিল্প, রসায়ন শিল্প ও কাঁচশিল্প প্রধান। **পিপ্পরীতে** এ্যালুমিনিয়াম কারখানা স্থাপিত রহিয়াছে। ইহা ছাড়া **রেওয়া, ছিন্দোয়ারা** ও **জব্বলপুরে** করাত কারখানা, **সারগুজায়** লাক্ষা শিল্প ও **ঝাঁসী** হস্তশিল্পের জন্য প্রসিদ্ধ। **ছাত্রাপুর** ও **পান্না** প্রস্তর ও হীরক কাটার শিল্পের জন্য বিখ্যাত।

পরিবহণ : অঞ্চলটিতে রাজপথ ও রেলপথ পরিবহণে সাহায্য করে। দক্ষিণ-পূর্ব রেলপথ ও মধ্য রেলপথ অঞ্চলটির মধ্য দিয়া পূর্ব-পশ্চিমে যোগাযোগ রক্ষা করে। উভয় রেলপথ ব্রডগেজ। **ভূপালে** একটি বিমানঘাটি বিদ্যমান।

প্রসিদ্ধ স্থান : অঞ্চলটিতে বর্তমান মধ্যপ্রদেশ নামক রাজ্যটি অবস্থিত। উহার রাজধানী **ভূপাল** একটি শিল্পকেন্দ্র। উহা মহাদেব পর্বতে ১০৬৫ মিটার উচ্চে অবস্থিত। **পাঁচমারী** শহরটি মধ্যপ্রদেশের রাজ্যপালের গ্রীষ্মাবাস। **গোয়ালিয়র**—মধ্যপ্রদেশের প্রাচীন রাজধানী। এখানে সিমেন্টের ও কৃত্রিম রেশম শিল্পের কারখানা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। গোয়ালিয়র দুর্গ প্রসিদ্ধ। **ইন্দোর**—বয়ন শিল্প ও শর্করা শিল্পের জন্য খ্যাত। **রেওয়া**—প্রাচীন বিন্ধ্য প্রদেশের রাজধানী ছিল। বর্তমানে উহা মধ্যপ্রদেশ রাজ্যের জিলা বিশেষ। এখানে কয়লাখনি রহিয়াছে। **কাম্পতী** ও **সগর**—সেনানিবাস। সগরে একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। **উজ্জয়িনী**—হিন্দুযুগের প্রাচীন নগর। ইহা ইতিহাস-প্রসিদ্ধ মহারাজ বিক্রমাদিত্যের রাজধানী ছিল। ১৯৫৭ খ্রীষ্টাব্দে এই শহরে বিক্রম বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়। **নেপানগর**—সংবাদপত্রের কাগজ নিউজপ্রিন্ট প্রস্তুতের কারখানার জন্য প্রসিদ্ধ। **জব্বলপুর** —মর্মর প্রস্তর, বয়নশিল্প ও তৈলশিল্পের জন্য প্রসিদ্ধ। **পিম্প্রী**—পেনিসিলিন ঔষধ তৈয়ারীর কারখানার জন্য প্রসিদ্ধ।

(২) লাভা অঞ্চল

দাক্ষিণাত্যের উত্তর-পশ্চিম ভাগে **লাভা অঞ্চল** সাধারণতঃ কৃষ্ণমৃত্তিকা অঞ্চল বলিয়া পরিচিত। ইহা পর্বত ও বন্ধুর সমভূমি লইয়া গঠিত। এই অঞ্চলের পর্বতগুলি সারি দিয়া সাজান। উহাদের পার্শ্বদেশ বেশ খাড়াই এবং উপরিভাগ একতল বিশিষ্ট। অঞ্চলটিতে কোন এক সময় ভূভাগের ফাটল দিয়া ভূগর্ভস্থ গলিত লাভা উত্থিত হওয়ায় গলিত লাভা ভূ-ত্বকের রূপ বদলাইয়া দেয়। ভূ-ত্বক অনেকটা চামড়ার মত কুঞ্চিত। মাটি বেশ কাল এবং উহা উদ্ভিদখাদ্যপ্রাণে পূর্ণ। লাভা অঞ্চলের উত্তর ভাগ গুজরাটের সমভূমি মালওয়া মালভূমি এবং মধ্যপ্রদেশের পশ্চিম-ভাগের কিছুটা লইয়া গঠিত। অঞ্চলটির দক্ষিণ ভাগ মহারাষ্ট্রের মালভূমি লইয়া

গঠিত। অঞ্চলটি **নর্মদা, তাপ্তী, মাহী** ও **সবরমতী** নদী চারিটি দ্বারা বিধৌত। নদীগুলি পশ্চিমবাহিনী। উহারা কাম্বে উপসাগরে পড়িয়াছে। দক্ষিণে গোদাবরী নদীর উৎস বিদ্যমান। রাজস্থান রাজ্যের পূর্বাংশ, গুজরাট রাজ্যের উত্তরাংশ ও মহারাষ্ট্র রাজ্যের উত্তর ও পশ্চিমাংশের সামান্য অংশ এবং মধ্য প্রদেশের পশ্চিমাংশ লইয়া এই অঞ্চল গঠিত। কাহারও কাহারও মতে অঞ্চলটি উদয়পুর-গোয়ালিয়র-মাল-মালভূমি নামে কথিত হইতে পারে। বস্তুতঃ ইহাই লাভা অঞ্চল।

প্রাকৃতিক পরিবেশ—

অবস্থান ও ভূ-প্রকৃতি ঃ অঞ্চলটির পরিসীমা হইল—উত্তর সীমায় রাজস্থান, পূর্বসীমায় মধ্যপ্রদেশ ও মহারাষ্ট্রের পূর্বাঞ্চল। দক্ষিণে মহারাষ্ট্রের দক্ষিণের সীমাঞ্চল এবং পশ্চিমে কঙ্কণ তটভূমি ও কচ্ছ-কাথিওয়াড় উপদ্বীপ। আয়তনে অঞ্চলটি ২·৫ লক্ষ বর্গ কিলোমিটার। গুজরাট রাজ্যের পূর্বভাগ ও মহারাষ্ট্র রাজ্যের পশ্চিমার্ধের অনেকটা এই অঞ্চলের অন্তর্গত।

জলবায়ু ঃ অঞ্চলটিতে মৌসুমী জলবায়ু বিরাজমান। সামুদ্রিক প্রভাবে পশ্চিমভাগে শীত-গ্রীষ্মে তাপের হ্রাস ও বৃদ্ধি কম। বারিপাত কৃষি উপযোগী। পশ্চিম ভাগের জলবায়ু সামুদ্রিক ভাবাপন্ন মৌসুমী। পূর্বভাগে মালভূমি ও পর্বতে শীতের তীব্রতা অধিক। গ্রীষ্মকালে তাপের পরিমাণ মধ্যম বলিয়া উভয় ঋতুর তারতম্য অত্যধিক। গড় বারিপাত ৭৫—৯৭ সে. মি.

উদ্ভিজ্জ ঃ উপকূলে ও সমভূমিতে আম, কাঁঠাল, সুপারী ও নারিকেল জন্মে। পর্বতগাত্রের পশ্চিমে মেহগিনি, চন্দন ও সেগুন বৃক্ষ সহজে জন্মে। পূর্বভাগে মালভূমি অঞ্চলে শাল, নিম ও হরিতকী গাছ জন্মে।

জীবজন্তু ঃ গৃহপালিত পশু বলিতে গবাদি পশুই প্রধান। দুগ্ধজাত সামগ্রী আর্থিক নীতিতে উৎপন্ন হয়। কমপক্ষে ২০টি দুগ্ধকেন্দ্রে দুগ্ধ সংরক্ষণের ব্যবস্থা আছে।

খনিজ সম্পদ ঃ বর্তমানে **জিপ্সাম, চূণাপাথর, বক্সাইট** ও **ইলিমেনাইট** অঞ্চলটির খনিতে আকরিত হয়। অঞ্চলটিতে তাপ-বিদ্যুৎ ও জল-বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়। অভ্র, সীসা, দস্তা ও তামা খনিজ অবস্থায় উত্তোলিত হয়। উদয়পুর-গোয়ালিয়র অঞ্চলে সোপষ্টোন খনি হইতে উত্তোলিত হয়।

অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিবেশ—

অধিবাসী ঃ অঞ্চলটিতে কমপক্ষে সাড়ে তিন কোটি লোকের বাস। প্রতি কিলোমিটারে অধিবাসীদের ঘনত্ব প্রায় ১৩০ জন। প্রতি হাজার পুরুষের অনুপাতে স্ত্রীলোকের সংখ্যা ৯০৬ জন। অধিবাসীদের মধ্যে শিক্ষিতের সংখ্যা ৪০ শতাংশ। অধিবাসীরা গুজরাটী, মারাঠি ও হিন্দী ভাষায় কথাবার্তা বলে। ইংরেজী ভাষায়ও

বহু লোক কথোপকথন করে। অঞ্চলটিতে শিক্ষাব্যবস্থা প্রসারলাভ করিতেছে। অধিবাসীরা ভাত, আটার রুটি, চাপাটি, ডাল, শাক-সব্জী ও দধি প্রভৃতি আহার করে। অধিবাসীরা উদ্যোগী ও পরিশ্রমী। কৃষি ও শ্রমশিল্পে বহু লোক নিযুক্ত আছে। কৃষিজীবীর সংখ্যা ৭০ শতাংশ। ২০ শতাংশ অধিবাসী শিল্পশ্রমিক। অবশিষ্ট লোক পরিবহণ ও অন্যান্য কর্মে নিযুক্ত রহিয়াছে ; এখানে বহু ধনী লোক বাস করে।

কৃষি ও জলসেচ ঃ অঞ্চলটির নদী উপত্যকার সমভূমিতে ধান, ডাল, তৈলবীজ, ভুট্টা, জোয়ার, বাজরা, ইক্ষু, গম ও তামাক উৎপন্ন হয়। এখানে চীনাবাদামের চাষ বহু জমিতে দেখা যায়। কৃষ্ণমৃত্তিকা অঞ্চলে প্রচুর তুলা জন্মে।

অঞ্চলটির মোট আয়তনের ৫০ শতাংশ জমি কৃষির উপযোগী। আবাদী জমির মোট আয়তন কমপক্ষে ২০০ লক্ষ হেক্টার। আবাদী জমির ৮৮ শতাংশে জলসেচ প্রকল্পগুলির মধ্যে বানস, হাতিমাটি, কাক্রাপার, মাহী-দক্ষিণ তীর খাল, মাহী-কাদানা, নর্মদা, উকাই, সেতরুঞ্জী, ভীমা, ঘোদ, গীর্ণা, কুকাদী ও মূলা পরিকল্পনা অন্যতম।

বিদ্যুৎ ও শ্রমশিল্প ঃ অঞ্চলটিতে তাপবিদ্যুৎ ও জলবিদ্যুৎ পরিবেশিত হয়। উকাই জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রের ৪টি উৎপাদন কেন্দ্রে জলবিদ্যুৎ উৎপাদন হইবার কথা। উহাদের প্রত্যেকটি ১২০ মেগাওয়াট জলবিদ্যুৎ উৎপাদন করিবে। কাম্বে ও আঙ্কলেশ্বর অঞ্চলে ৫৪ মেগাওয়াট তাপবিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়। **কাম্বে** শহরের ১০ কিলোমিটার দূরে **ধুবরণ** নামক স্থানে তাপবিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়। সেখানে মোট ৬টি যন্ত্রে বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়। প্রথম চারিটির প্রত্যেকটি ৬৪ মেগাওয়াট এবং অপর দুইটির প্রত্যেকটি ১৪০ মেগাওয়াট তাপবিদ্যুৎ উৎপাদন করে। ইহা ছাড়া **নাসিক** তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র ও **বৈতার্ণা** জলবিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র হইতে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হয়। অঞ্চলটিতে বিদ্যুৎ শ্রমশিল্পের বিশেষ চালক শক্তি। এখানে কয়লার অভাব রহিয়াছে।

অঞ্চলটি বয়ন শিল্প, রেশম শিল্প, সিমেণ্ট, কাগজ ও লবণ শিল্পের জন্য খ্যাত। অঞ্চলটির কোন কোন স্থানে রসায়ন শিল্প, পেট্রোকেমিকেল শিল্প, চলচ্চিত্র শিল্প এবং ইস্পাত সামগ্রী, যানবাহন ও সার প্রস্তুত কারখানা, কাঁচশিল্প ও দুগ্ধকেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছে। চর্ম, কার্পেট ও পশম শিল্পের জন্য অঞ্চলটি বিখ্যাত।

পরিবহণ ও বাণিজ্য ঃ অঞ্চলটি স্থলপথে, জলপথে ও বিমানপথে রাষ্ট্রের অন্যান্য রাজ্য ও সন্নিহিত রাষ্ট্রগুলির সহিত যোগাযোগ রক্ষা করে। স্থলপথ, জলপথ ও রেলপথ লোক যাতায়াতের ও সামগ্রী সরবরাহের মাধ্যম। রাজপথের মোট দৈর্ঘ্য ৪০ হাজার কিলোমিটার অপেক্ষা সামান্য অধিক হইবে। আহমেদাবাদ হইতে রেলপথ ভারতের অন্যান্য রাজ্যে গিয়াছে। স্থানটির মধ্য দিয়া ব্রডগেজ, মিটারগেজ ও ন্যারোগেজের

রেলপথ যোগাযোগ রক্ষা করে। **মধ্য ও পশ্চিম রেলপথ** এখানকার বিশেষ রেলপথ। **দক্ষিণ-পূর্ব রেলপথ, দক্ষিণ রেলপথ, পশ্চিম ও মধ্য রেলপথগুলি** অঞ্চলটির মধ্য দিয়া প্রান্তিক ষ্টেশন বোম্বাই-এ পৌছে। অঞ্চলটিতে মিটারগেজ রেলপথের দৈর্ঘ্য সর্বাধিক। উহার পর ব্রডগেজ ও ন্যারোগেজ রেলপথের স্থান।

এই অঞ্চল হইতে গম, মিলেট, সিমেণ্ট, কার্পাস বস্ত্র, হোসিয়ারী সামগ্রী, রেশম ও পশম বস্ত্র, বিলাসদ্রব্য, ঔষধ ও সার **রপ্তানি** করা হয়। বিনিময়ে **আমদানি** করা হয় পাটজাত দ্রব্য, চা, চিনি, খাদ্য উপযোগী তৈল, খনিজ তৈল, ইস্পাত ও কাঁচামাল ইত্যাদি। অঞ্চলটির আর্থিক অবস্থা উন্নত।

প্রসিদ্ধ স্থানঃ পুনা—মহারাষ্ট্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ নগর। চতুর্দিকে পাহাড় বেষ্টিত এই নগরের দৃশ্য খুবই মনোরম। এই নগর মারাঠা বীর ছত্রপতি শিবাজীর কর্মময় জীবনের সঙ্গে জড়িত ছিল। **সোলাপুর**—কাপড়ের কলের জন্য বিখ্যাত। **নাসিক**—ইহা গোদাবরী নদীর তীরে অবস্থিত। মন্দির ও স্নানের ঘাটের জন্য প্রসিদ্ধ। **মহাবালেশ্বর**—ইহা একটি প্রসিদ্ধ পার্বত্যনিবাস। এখানে একটি মনোরম হ্রদ ও অনেকগুলি সুন্দর উদ্যান আছে। **নান্দেদ**—এখানে গুরু গোবিন্দসিংহের সমাধি মন্দির আছে। ইহা শিখদের পবিত্র স্থান। **সেবাগ্রাম**—ওয়ার্ধার নিকটে ইহা একটি বিখ্যাত গ্রাম। মহাত্মা গান্ধী এখানে বহু বৎসর বাস করেন ও ভারতের স্বাধীনতার জন্য কাজ করেন। আজও সেবাগ্রাম আশ্রমে গান্ধীজীর ব্যবহৃত কলম, ঘড়ি, লাঠি ও বই প্রভৃতি দেখিতে পাওয়া যায়। **আউরঙ্গাবাদ**—একটি শহর। ইহার নিকটে অজন্তা ও ইলোরা গুহা অবস্থিত। এই দুই গুহা প্রাচীন ভারতের চিত্রকলা ও ভাস্কর্যের জন্য প্রসিদ্ধ। প্রতি বৎসর হাজারে হাজারে পর্যটক এই গুহাগুলি দেখার জন্য এখানে আসেন।

(৩) দাক্ষিণাত্যের প্রকৃত মালভূমি

প্রাকৃতিক পরিবেশ—

অবস্থান ও ভূপ্রকৃতিঃ দাক্ষিণাত্যের সমগ্র মালভূমি আগ্নেয়শিলা দ্বারা গঠিত। এখানকার ভূত্বক সামান্য বেধযুক্ত মাটি দ্বারা আবৃত। মৃত্তিকার রঙ লাল। উহা উদ্ভিদখাদ্যপ্রাণে বিশেষ পুষ্ট নহে। ভূগর্ভে শিলাস্তর খনিজ সম্পদে পূর্ণ। স্থানে স্থানে ভূত্বকে মৌসুমী বৃক্ষ দিয়া ঢাকা বনভূমি বিদ্যমান। মালভূমিটি **মহানদী, গোদাবরী, কৃষ্ণা ও কাবেরী** নদী চারিটি ও উহাদের উপনদীগুলি দ্বারা বিধৌত। নদীগুলি অগভীর। নদীগর্ভের কঠিন শিলা নগ্নীভূত। ক্ষয়ীকরণ আর সম্ভব নয়। বর্ষার দিনে অধিক বারিবর্ষণে প্লাবন হইয়া থাকে।

দাক্ষিণাত্যের মালভূমির গড় উচ্চতা প্রায় ৫২৮ মিটার। ইহার বন্ধুর ভূ-ভাগে স্থানে স্থানে গম্বুজাকৃতি পাহাড় পৃথক পৃথক ভাবে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। মালভূমির সাধারণ ঢাল পশ্চিম হইতে পূর্বদিকে। মালভূমিটির দুইটি ভাগ স্পষ্ট। দক্ষিণভাগ **(ক) মহীশূর মালভূমি** এবং উত্তর-পূর্বভাগ **(খ) ছোটনাগপুর মালভূমি** নামে কথিত।

(ক) মহীশূর মালভূমি পশ্চিমপ্রান্তে পশ্চিমঘাট পর্বত উত্তর হইতে দক্ষিণ দিক পর্যন্ত বিস্তৃত। মালভূমিটির উত্তরদিকে দাক্ষিণাত্যের কৃষ্ণ মৃত্তিকাঞ্চল ও দাক্ষিণাত্যের উত্তর পার্বত্য অঞ্চল, পূর্বদিকে দাক্ষিণাত্যের সমভূমি ও তটভূমি, দক্ষিণ দিকে মালাবার ও করমণ্ডল তটভূমি এবং পশ্চিমদিকে মালাবার তটভূমি অবস্থিত। মহীশূর মালভূমিটি মহারাষ্ট্র রাজ্যের দক্ষিণ-পূর্বের কিছুটা, কেরলরাজ্যের পূর্বাংশের কিছুটা, সমগ্র কর্ণাটক (মহীশূর) রাজ্য এবং অন্ধ্রপ্রদেশ ও তামিলনাড়ু রাজ্যদ্বয়ের পশ্চিমাংশ লইয়া গঠিত।

(খ) ছোটনাগপুর মালভূমির উত্তর দিকে গঙ্গার মধ্যগতি অঞ্চল, পূর্বদিকে পশ্চিমবঙ্গ, দক্ষিণ দিকে দাক্ষিণাত্যের সমভূমি এবং পশ্চিমদিকে মধ্যপ্রদেশের ও মহারাষ্ট্রের পূর্বাংশ অবস্থিত। ওড়িষ্যা রাজ্যের মহানদী উপত্যকা ব্যতীত সমগ্র রাজ্য, বিহার রাজ্যের দক্ষিণ ভাগ, পশ্চিমবঙ্গের পুরুলিয়া জিলা এবং মধ্যপ্রদেশ রাজ্যের মহানদীর প্রাথমিক গতি অঞ্চল সমেত পূর্বভাগ লইয়া মালভূমিটি গঠিত।

জলবায়ু ঃ দাক্ষিণাত্যের প্রকৃত মালভূমি অঞ্চলে মৌসুমী জলবায়ুর বারিপাত পশ্চিম হইতে পূর্বদিকে অধিক। পশ্চিমপ্রান্তে উপকূলের দিকে পর্বতগাত্রে বারিপাত অত্যন্ত অধিক। কিন্তু পাহাড়ের পূর্বগাত্রে এবং মালভূমির পশ্চিমাংশে বারিপাতের অনুপাত সামান্য। মালভূমির পূর্বভাগে কোন কোন স্থানে বারিপাত যৎসামান্য। ছোটনাগপুর মালভূমিতে বৃষ্টিপাত মধ্যম। এই মালভূমিতে তাপ চরমভাবাপন্ন। মহীশূর মালভূমিতে অনেক স্থানে জলবায়ু মহাদেশীয় মৌসুমী। ছোটনাগপুর মালভূমিতে জলবায়ু মৌসুমী।

উদ্ভিদ ও জীবজন্তু ঃ মালভূমির পশ্চিমভাগে স্বাভাবিক অবস্থায় কণ্টকবৃক্ষ ও তৃণ জন্মে। সেখানকার তৃণভূমি বর্তমানে বিস্তারে সামান্য হইলেও একদা উহা উত্তর হইতে দক্ষিণে বিস্তৃত ছিল। বর্তমানে জলসেচ নিয়ন্ত্রণে তৃণভূমি কৃষিভূমিতে পরিণত হইয়াছে। পূর্বভাগে বিশেষতঃ ছোটনাগপুর মালভূমিতে মৌসুমী পর্ণমোচী বৃক্ষ অধিক। সেখানে শাল, সেগুন, তুঁত, শিরীষ, বট, পলাশ, শিমূল, অশ্বত্থ ও নিম প্রভৃতি বৃক্ষ অধিক দেখা যায়। স্থানে স্থানে আম, কাঁঠাল ও পেয়ারা বাগান

ঋতুবিশেষে সুস্বাদু ফল যোগায়। বনভূমিতে হিংস্র পশু ও হরিণ দেখা যায়। গৃহপালিত গবাদি পশু নানা স্থানে পালিত হয়।

খনিজ সামগ্রী ঃ কয়লা, খনিজ লৌহ, খনিজ ম্যাঙ্গানিজ, বক্সাইট, খনিজ তাম্র, অভ্র ও স্বর্ণ প্রভৃতি দাক্ষিণাত্যের মালভূমির উল্লেখযোগ্য খনিজ সামগ্রী।

পূর্বভাগে **ছোটনাগপুর মালভূমিতে** দক্ষিণ বিহারের দামোদর নদের প্রাথমিক গতি অঞ্চল হইতে মধ্যপ্রদেশের রেওয়া জিলা হইয়া ওড়িষ্যার তালচের ও মহারাষ্ট্রের চান্দা জিলা পার হইয়া অন্ধ্রপ্রদেশের সিঙ্গারেনী, কোঠাগুডাম ও গভীরীদেবী পেটা পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চলের স্থানে স্থানে **কয়লার খনি** বিদ্যমান।

ছোটনাগপুর মালভূমিতে বিহার রাজ্যের সিংভূম জিলায়, ওড়িষ্যারাজ্যের কিয়ঞ্চরগড়, ময়ূরভঞ্জ ও বোনাই জিলাত্রয়ে, মধ্যপ্রদেশের বিলাসপুর ও জগদলপুর জিলা দুইটিতে এবং **মহীশূর মালভূমিতে** মহারাষ্ট্রের চান্দা ও রত্নগিরি জিলাদ্বয়ে, কর্ণাটকে বেলারী জিলায়, তামিলনাড়ুতে সালেম ও মাদুরাই জিলাদ্বয়ে এবং অন্ধ্রপ্রদেশের কুর্ণুল ও কুড্ডাপা জিলা দুইটিতে **খনিজ লৌহ** আকর হইতে তোলা হয়।

ইহা ছাড়া **মহীশূর মালভূমিতে** অন্ধ্রপ্রদেশের নেলোর জিলায়, কর্ণাটকের বেলারী, সিমোগা, বেলগাঁও ও চিতলদ্রুগ জিলাগুলিতে ও মহারাষ্ট্রের ভাণ্ডারা ও নাগপুর জিলা দুইটিতে ; **ছোটনাগপুর মালভূমিতে** ওড়িষ্যার কোরাপুট, কিয়ঞ্চরগড়, বোনাই ও কালাহাণ্ডি জিলাগুলিতে এবং বিহারের সিংভূম জিলায় **খনিজ ম্যাঙ্গানিজ** আকর হইতে সংগ্রহ করা হয়।

মহীশূর মালভূমিতে অন্ধ্রপ্রদেশের নেলোর জিলায়, তামিলনাড়ু রাজ্যের মাদুরাই জিলায় এবং কর্ণাটক রাজ্যের মহীশূর ও হাসান জিলাদ্বয়ে **অভ্রখনি** আছে। **ছোটনাগপুর মালভূমিতে** রাঁচী ও হাজারীবাগ জিলাদ্বয়ে **অভ্রখনি** এবং **সিংভূম** জিলায় মোসাবনীতে **তাম্রের** খনি রহিয়াছে। উভয় অঞ্চলে **তাম্র ও অভ্র** খনি হইতে উত্তোলিত হয়।

অন্ধ্রপ্রদেশের কুর্ণুল ও নেলোর জিলাদ্বয়ে এবং কর্ণাটক রাজ্যের চিতলদ্রুগ জিলায় **খনিজ তাম্রের** খনি রহিয়াছে।

মহীশূর মালভূমিতে মহারাষ্ট্র রাজ্যের কোলাপুরে, তামিলনাড়ু রাজ্যের সালেম জিলায়, কর্ণাটকের বেলগাঁও জিলায়, **ছোটনাগপুর মালভূমিতে** ওড়িষ্যা রাজ্যের সম্বলপুর জিলায় এবং বিহার রাজ্যের রাঁচি ও পালামৌ জিলা দুইটিতে **বক্সাইট** বা **খনিজ এ্যালুমিনিয়মের** খনি রহিয়াছে। এক কথায় বলা চলে দাক্ষিণাত্যের প্রকৃত মালভূমি খনিজ সম্পদে পূর্ণ। বর্তমানে মালভূমির কোন কোন স্থানে দস্তা, সীসা ও বিরল ধাতু খনিজ অবস্থায় পাওয়া গিয়াছে। বিরল ধাতু বলিতে ইউরেনিয়াম,

থোরিয়াম, মলিবডেনাম, ভ্যানাডিয়াম প্রভৃতি ধাতুকে বুঝায়। এইগুলি আণবিক শক্তি সঞ্চারে সাহায্য করে।

অর্থ নৈতিক ও সামাজিক পরিবেশ—

অধিবাসী : দাক্ষিণাত্যের প্রকৃত মালভূমি অঞ্চলের ভৌগোলিক আয়তন প্রায় ৬ লক্ষ বর্গ কিলোমিটার। উহাতে প্রায় নয় কোটি লোকের বাস। প্রতি বর্গ কিলোমিটারে গড়ে ১৫০ জন লোক বাস করে। অধিবাসীরা হিন্দী, ওড়িয়া, তামিল, মারাঠী, কানাড়ী ও মালয়ালাম্ ভাষায় কথা বলে। এই সকল ভাষাভাষী অধিবাসীদের বণ্টন মোটামুটি—উত্তর ভাগে হিন্দী, উত্তর-পূর্বে ওড়িয়া, উত্তর-পশ্চিমে ও পশ্চিমে মারাঠী, পূর্বভাগে তেলেগু, মধ্যভাগে কানাড়ী, দক্ষিণ-পূর্বে তামিল এবং দক্ষিণ-পশ্চিমে মালয়ালাম্। অধিবাসীদের মধ্যে শিক্ষিতের হার প্রায় ৩০ শতাংশ। অধিবাসীরা কর্মঠ ও কৃষিকার্যে রত। বর্তমানে শিল্পশ্রমিক ও সাধারণ শ্রমিকের সংখ্যা দিন দিন বাড়িতেছে। মালভূমি অঞ্চলেপ্রাকৃতিক সম্পদব্যবহারে অধিবাসীরা উদ্যোগী।

জলসেচ ও বিদ্যুৎ : প্লাবন হইতে কৃষিভূমিকে বাঁচাইতে বহু পূর্বেই নদীতে নদীতে বাঁধ দিয়া জলাধার নির্মাণ করা হয়। বন্যারোধ হওয়ায় জলাধারের জল দিয়া সেচকার্য ও জলবিদ্যুৎ উৎপাদন সম্ভব হইয়াছে। এই বিষয়ে ওড়িষ্যা ও অন্ধ্রপ্রদেশ রাজ্যদ্বয়ের **মাচকুন্দ পরিকল্পনা**, কর্ণাটক ও অন্ধ্রপ্রদেশ রাজ্যদ্বয়ের **তুঙ্গভদ্রা পরিকল্পনা** ও তামিলনাড়ু রাজ্যের **কুণ্ডা পরিকল্পনা** উল্লেখযোগ্য। ইহা ছাড়া মহারাষ্ট্রের লোনাভলায় **খোপলী**, অন্ধ্র উপত্যকায় **বিভপুরী**, নীলামূলায় **ভীরা** প্রভৃতি স্থানে নদীতে বাঁধ দিয়া জলসেচের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। তামিলনাড়ুতে **মেটুর, পাইকারা** ও **পাপনাশম্** প্রকল্পে, কর্ণাটক রাজ্যে **শিবসমুদ্রম্** ও **সিমলা** পরিকল্পনায়, **যোগ জলপ্রপাতে** এবং কেরল রাজ্যে **পল্লীভাসাল** প্রকল্পে নদীতে বাঁধ দিয়া জলবিদ্যুৎ উৎপাদন করা হয়।

কৃষি : জোয়ার, বাজরা, রাগী, ডাল, যব, চীনাবাদাম ও তৈলবীজ শুষ্ক অঞ্চলে জন্মে। নদী উপত্যকায় ধান, গম, ইক্ষু ও ছোলা উৎপন্ন হয়। জলসেচ অঞ্চলে গম ও তূলা জন্মে। অঞ্চলটিতে নানা জাতীয় তামাক গাছের চাষ করা হয়। মালভূমির উত্তর-পশ্চিমে বিড়ির তামাক পাতা অধিক জন্মে। দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চলে তামাক পাতা দিয়া সিগারেট ও সিগার প্রস্তুত হয়। দক্ষিণ-পূর্ব ও পূর্বভাগে মালভূমির জলসেচ অঞ্চলে ইক্ষু, রেড়িবীজ, তিল ও তিসি অধিক উৎপন্ন হয়। অন্ধ্রপ্রদেশে ঐ সকল ফসল অধিক জন্মে।

শ্রমশিল্প : ছোটনাগপুর মালভূমি অঞ্চলে ওড়িষ্যার **রাউরকেলায়** লৌহ ও ইস্পাত কারখানা স্থাপিত হইয়াছে। বিহার রাজ্যে **জামসেদপুরে** বেসরকারী

সংস্থা **টাটা আয়রন এণ্ড ষ্টীল কোম্পানী** ও **বোকারোতে** সরকারী সংস্থা **হিন্দুস্থান ষ্টীল** এর ইস্পাত কারখানা রহিয়াছে। মহীশূর রাজ্যে **মহীশূর আয়রন এণ্ড ষ্টীল কোম্পানী** চালু রহিয়াছে। ভবিষ্যতে কর্ণাটক রাজ্যে **হসপেটের** নিকট **বিজয়নগর** নামক স্থানে, তামিলনাড়ুতে **সালেমে** এবং অন্ধ্রপ্রদেশে **কর্ণুলে** এক একটি করিয়া অপর তিনটি সরকারী লৌহ ইস্পাত কারখানা স্থাপিত হইবে। সকল চালু কারখানায় বহু শ্রমিক রাতদিন কাজ করে এবং এখানে নানারকমের ইস্পাত সামগ্রী প্রস্তুত হয়। ইহা ছাড়া এই অঞ্চলে সিমেণ্ট কারখানা, কাপড়ের কল, কাগজের কল, ধাতুনির্মিত তৈজসপত্র তৈরির কারখানা, রেলগাড়ী নির্মাণ কারখানা, হিন্দুস্থান এয়ারক্রাফ্‌ট্ কারখানা এবং নানা বিলাসদ্রব্য প্রস্তুত কারখানা নিত্য বহুবিধ সামগ্রী উৎপাদন করে। এই অঞ্চলে স্থানে স্থানে কাঁচ শিল্প ও রসায়ন শিল্প বিশেষ উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে। ছোটনাগপুর ও মহীশূর উভয় মালভূমির পূর্বাঞ্চলের কয়লা ও খনিজ সামগ্রী নানাবিধ কারখানা স্থাপনে সাহায্য করে। পশ্চিমভাগে জলবিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধি পাওয়ায় শ্রমশিল্পে ও পরিবহণে যথেষ্ট সুবিধা হইয়াছে। স্বাধীনতা লাভের পূর্বে রাষ্ট্রের এই অংশ অনুন্নত ছিল। বর্তমানে বিভিন্ন পরিকল্পনার মাধ্যমে অঞ্চলটি আর্থিক বিষয়ে উন্নতির পথে। এই অঞ্চলে কুটীরশিল্পেও রেশম ও সূতি বস্ত্র প্রভৃতি নানাবিধ সামগ্রী প্রস্তুত হয়।

পরিবহণ ও বাণিজ্য ঃ অঞ্চলটির মধ্য দিয়া **দক্ষিণ-পূর্ব, দক্ষিণ ও মধ্য রেলপথ** সন্নিহিত রাজ্যগুলির সহিত যোগাযোগ রাখে। **রাজপথ** দীর্ঘ এবং অধিকাংশ স্থলে উহা পাকা। বর্তমানে পরিবহণ ব্যবস্থার যথেষ্ঠ উন্নতি হওয়ায় অঞ্চলটিতে রেলগাড়ী ও মোটরগাড়ী নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির সরবরাহ বজায় রাখে। **বিমানপথেও** যাত্রী পরিবহণ ও সামগ্রী সরবরাহ করা হয়। **বাঙ্গালোর, মহীশূর ও নাগপুর** বিশেষ বিমানঘাঁটি। অঞ্চলটি সমুদ্র হইতে দূরে বলিয়া জলপথের সুযোগ-সুবিধা কম। অন্য অঞ্চলের মধ্য দিয়া জলপথবাহী পণ্যদ্রব্য আদান-প্রদান হয়।

অঞ্চলটি হইতে কাষ্ঠ, খনিজ সামগ্রী, মসলা, যান-বাহন, কফি ও খাদ্য-সামগ্রী **রপ্তানি** হয়। এখানকার **আমদানী** সামগ্রী বলিতে যন্ত্রপাতি, পাটজাত সামগ্রী ঔষধ, বিলাস দ্রব্য, পোষাক-পরিচ্ছদ, ফলমূল, সুপারী, পান ও নারিকেল প্রভৃতি সামগ্রীকে বুঝায়।

প্রসিদ্ধ স্থান ঃ সিন্দ্রি—সরকারী তত্ত্বাবধানে রাসায়নিক সার উৎপাদন কেন্দ্র। **হাজারীবাগ, গিরিডি, মধুপুর**—স্বাস্থ্যকর স্থান। **ধানবাদ**—কয়লা খনির কেন্দ্র ও পূর্বরেলপথের জংশন। **গয়া ও বৈদ্যনাথ ধাম**—হিন্দুদের তীর্থস্থান। **রাঁচি**—বিহার রাজ্যের রাজ্যপালের গ্রীষ্মাবাস। এখানে উন্মাদ ব্যক্তিদের চিকিৎসাকেন্দ্র

আছে। এখানে একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। **হাতিয়া** (রাঁচি)—এখানে ভারী যন্ত্র নির্মাণের শিল্প-কারখানা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। **ঝরিয়া**—কয়লাখনির জন্য প্রসিদ্ধ। **পালামৌ**—একটি রেল ষ্টেশন। ইহা একটি স্বাস্থ্যকর স্থান। ইহার প্রাকৃতিক দৃশ্য মনোরম। **রাজগীর**—ইতিহাস-প্রসিদ্ধ স্থান। ইহার প্রাচীন নাম **রাজগৃহ**। এখানে একটি উষ্ণ প্রস্রবণ আছে। **জামসেদপুর**—এখানে টাটা কোম্পানীর লৌহ ও ইস্পাতের বিরাট কারখানা আছে। ইহা এশিয়ার মধ্যে বৃহত্তম লৌহ-ইস্পাত কারখানাগুলির মধ্যে একটি। **রাউরকেল্লা**—এখানে সরকারী তত্ত্বাবধানে হিন্দুস্থান ইস্পাত কারখানা স্থাপিত হইয়াছে। **নাগপুর**—বস্ত্রশিল্পের কেন্দ্র এবং প্রসিদ্ধ রেল জংশন। **অমরাবতী**—একটি প্রধান শহর ও তুলা ব্যবসায়ের কেন্দ্র। **বিজাপুর**—মোগলযুগের প্রসিদ্ধ শহর। এখানে প্রাচীন বিজাপুর রাজ্যের রাজধানী ছিল। **বাঙ্গালোর**—এখানে ভারতীয় বিজ্ঞান পরিষদ (Indian Institute of Science) নামক বিজ্ঞান বিষয়ক গবেষণাগার আছে। এখানে বর্তমানে বিশ্ববিখ্যাত বিমান-পোত নির্মাণের বৃহৎ কারখানা স্থাপিত রহিয়াছে। **বেলগাওঁ**—তুলা ব্যবসায়ের কেন্দ্র ও বস্ত্র-শিল্পের প্রধান নগর। এখানে একটি সেনানিবাস আছে। **ধারওয়ার**—তূলা ব্যবসায়ের ও বস্ত্রশিল্পের কেন্দ্র। **কোলার**—স্বর্ণখনির জন্য বিখ্যাত। **মহীশূর**—প্রাচীন শহর। এখানে একটি বিশ্ববিদ্যালয় আছে। **উটকামণ্ড**—স্বাস্থ্যকর স্থান। তামিলনাড়ুর রাজ্যপালের গ্রীষ্মাবাস। **হায়দরাবাদ**—অন্ধ্র রাজ্যের রাজধানী। ইহা ভারতের পঞ্চম বৃহৎ শহর। পূর্বতন দেশীয় রাজ্য হায়দরাবাদের উহা রাজধানী ছিল।

(৪) দাক্ষিণাত্যের সমভূমি

অবস্থান ও ভু-প্রকৃতি : এই অঞ্চলটির উত্তর দিকে দাক্ষিণাত্যের মহীশূর ও ছোটনাগপুর মালভূমি, পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্বে ভারতের পূর্ব-উপকূল, দক্ষিণ দিকে কন্যাকুমারী ও পূর্বঘাট-পর্বতমালা এবং পশ্চিমে মহীশূর মালভূমি। এই সমভূমি মহানদী, গোদাবরী, কৃষ্ণা ও কাবেরী নদী চারিটির মধ্যগতি অঞ্চল লইয়া গঠিত। মহানদীর মধ্যগতি অঞ্চলে রহিয়াছে ওড়িষ্যা রাজ্যের নদীমাতৃক জিলাগুলি—ধেনকানাল, পুরী ও কটক এবং মধ্যপ্রদেশের রেওয়া জিলা। অন্ধ্রপ্রদেশ, কর্ণাটক, মধ্যপ্রদেশ ও মহারাষ্ট্র রাজ্য চারিটির অনেকাংশ কৃষ্ণা ও গোদাবরী নদীর মধ্যগতি, অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত। ভাণ্ডারা, চান্দা, ওয়ার্ধা, ইয়োটমল, নান্দার, খামাম, নাগগোণ্ডা, কাডাম, বালাঘাট ও মান্দলা জিলাগুলি লইয়া কৃষ্ণা-গোদাবরীর মধ্যগতির সমভূমিটি গঠিত। উত্তর ও দক্ষিণ আর্কট, তিরুচিরাপল্লী ও কোয়েম্বাটোর জিলাগুলি কাবেরী উপত্যকায় রহিয়াছে। সমভূমির মৃত্তিকা লাল ও উহার বেধ অধিক নয়।

জলবায়ুঃ অঞ্চলটিতে মৌসুমী বাতাসে বৃষ্টিপাত হয়। গ্রীষ্মকালে দক্ষিণ-পশ্চিম বাতাসে এবং শীতের পূর্বে উত্তর-পূর্ব ও দক্ষিণ-পশ্চিম বাতাসের মিলনে ঘূর্ণিবাত সৃষ্টি হইলে বৃষ্টি পড়ে। বার্ষিক বারিপাত গড়ে ৯৮-১৫৭ সেঃ মিঃ। গ্রীষ্মে তাপমাত্রা উচ্চ এবং শীতকালে তাপমাত্রা মধ্যম। নদীমাতৃক এই সমভূমি কৃষিকার্যের উপযোগী।

উদ্ভিদ ও জীবজন্তুঃ অঞ্চলটিতে সুস্বাদু ফল—আম, কাঁঠাল, পেয়ারা, জামরুল ও কালজাম—অধিক জন্মে। স্থানে স্থানে বাঁশ ও বেত দেখা যায়। বর্তমানে আঞ্চলিক ফল ও কাষ্ঠ রাজস্ব বৃদ্ধি করে। এই অঞ্চলে গৃহপালিত গবাদি পশু অধিক।

খনিজ সম্পদ : সমভূমি অঞ্চলে অভ্রখনি বিদ্যমান। উত্তর ভাগে খনিজ ম্যাঙ্গানিজ ও খনিজ লৌহের আকর আছে। চূণাপাথর স্থান-বিশেষে খনন করা হয়।

অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিবেশঃ

অধিবাসীঃ দাক্ষিণাত্যের সমভূমি অঞ্চলে প্রায় ৩৩০ লক্ষ লোক বাস করে। অঞ্চলটির আয়তন প্রায় দেড়লক্ষ বর্গ কিলোমিটার। প্রতি বর্গ কিলোমিটারে কমপক্ষে ২২০ জন লোক বাস করে। অধিবাসীরা নানা ভাষাভাষী। উহার মধ্যে ওড়িয়া, তেলেগু, তামিল, কানাড়ী ও মারাঠী ভাষাভাষী বহু লোক আছে। শিক্ষিতের সংখ্যা ৩০ শতাংশ। অনেকেই কৃষিজীবী।

কৃষিঃ নদী উপত্যকায় জলসেচ প্রাধান্য লাভ করায় কৃষি অনেকটা শ্রীসম্পন্ন। ধান প্রধান খাদ্যশস্য। ডাল, তৈলবীজ, ইক্ষু, গম, জোয়ার, বাজরা, রাগী ও ছোলা অধিকাংশ জমিতে চাষ হয়। স্থানে স্থানে তামাক, তিসি ও তিল জন্মে। কাজু ও চীনাবাদামের চাষ ক্রমশঃ অগ্রগতির পথে। অঞ্চলটিতে অবস্থিত ওড়িয়্যার পুরী, কটক ও ধেনকানল জিলা তিনটি ধান, পাট, ডাল, ইক্ষু ও তৈলবীজ উৎপন্ন করে। মধ্যপ্রদেশের দুর্গ,_ বালাঘাট, মান্দলা ও জব্বলপুর জিলা চতুষ্টয় এবং মহারাষ্ট্রের ভাণ্ডারা ও চান্দা জিলা দুইটি কৃষি ও শিল্প কারখানার জন্য প্রসিদ্ধ। ধান, ডাল, সব্জী ও তৈলবীজ এই সকল জিলার বিশেষ ফসল। অন্ধ্রপ্রদেশের বিজয়ওয়াড়া, ওয়ারাঙ্গল, করিমনগর, সেকেন্দ্রাবাদ, নিজামাবাদ, হায়দ্রাবাদ, মাহবুবনগর, কুড্ডাপা, চিতুর এবং তামিলনাড়ুর ভেলোর, ত্রিচুর ও মাদুরাই প্রভৃতি জিলাগুলির স্থানে স্থানে ধান তৈলবীজ, ইক্ষু, ছোলা ও ডাল প্রভৃতি ফসল উৎপন্ন হয়। অঞ্চলটিতে জলসেচ প্রথা প্রচলিত। নদীগুলি অগভীর, বর্ষায় উহারা ভীষণ আকার ধারণ করে। বর্ষায় উপত্যকা প্লাবিত হয়।

বিদ্যুৎ ও শ্রমশিল্প ঃ অঞ্চলটিতে তাপবিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়। বিদ্যুৎ পরিবেশনের সুব্যবস্থা থাকায় এইখানে শিল্পকারখানা গড়িয়া উঠিয়াছে। **মধ্যপ্রদেশে** ভিলাইয়ের লৌহ-ইস্পাত কারখানা, **ওড়িষ্যার** এ্যালুমিনিয়াম কারখানা ও কাগজ-কল, **অন্ধ্র-প্রদেশের** কাগজ, চুরুট ও সিগারেট কারখানা **তামিলনাড়ুর** বয়ন-শিল্প কারখানা, যন্ত্রপাতি প্রস্তুত কারখানা ও চিনির কল বিশেষ উল্লেখযোগ্য। স্থানে স্থানে কৃষিজ তৈল কারখানা, চুরুটের কারখানা ও সাবান প্রস্তুতের কারখানা আছে।

পরিবহণ ও বাণিজ্য ঃ অঞ্চলটির ভিতর দিয়া রাজপথ ও রেলপথ রাষ্ট্রের অন্যান্য রাজ্যে গিয়াছে। **দক্ষিণ রেলপথ, দক্ষিণ-পূর্ব রেলপথ** ও **মধ্য রেলপথ** পরিবহণ কার্যে সহায়তা করে। আঞ্চলিক নদীগুলি নাব্য। নদীপথে শহর ও গ্রাম যুক্ত। বহিঃসমুদ্রে যাইতে উত্তর সরকার (Northern Circars) তটভূমির **পারাদ্বীপ** ও করমণ্ডল তটভূমির **মাদ্রাজ** বিশেষ বন্দর। ইহা ছাড়া **বিশাখাপত্তনম্, মাসুলিপত্তনম** ও **কারিকল** বন্দর তিনটির গুরুত্ব কম নহে। বিমানপথে **সেকেন্দ্রাবাদ, জব্বলপুর** ও **মাদ্রাজ** বিমানঘাঁটি তিনটির দান যথেষ্ট। অঞ্চলটিতে কৃষিজাত ফসল পর্যাপ্ত। ধান, তৈলবীজ, ছোলা, কাজুবাদাম ও সুমিষ্ট ফল এখানকার **রপ্তানি** বস্তুগুলির মধ্যে অন্যতম। পোষাক-পরিচ্ছদ, যানবাহন, যন্ত্রাদি, ধাতুসামগ্রী ও অন্যান্য নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রী এই অঞ্চলে বাহির হইতে **আমদানি** করা হয়।

প্রসিদ্ধ স্থান ঃ ভুবনেশ্বর, কটক, খুর্দা, তালচের, সম্বলপুর, রায়পুর, ভিলাই ও **দুর্গ** মহানদী উপত্যকায় বিশেষ বিশেষ নগর ও শহর। সরকারী তত্ত্বাবধানে পরিচালিত ভিলাইয়ের ইস্পাত কারখানা প্রসিদ্ধ। **চিতুর**—বাণিজ্যিক কেন্দ্র। মাদ্রাজে কাবেরী উপত্যকায় **তাঞ্জোর, তিরুচিরাপল্লী, মাদুরাই** ও **ভেলোর** কৃষিকার্যে ও কুটিরশিল্পে উন্নত। ভেলোরের বিশেষ চিকিৎসা কেন্দ্রটি বৎসরে শতশত রোগীকে নিরাময় করে। তিরুচিরাপল্লীতে চুরুট তৈরী হয়।

দাক্ষিণাত্যের মালভূমির প্রভাব ঃ (১) সমগ্র দাক্ষিণাত্যের মালভূমি, সমভূমি ও পার্বত্যাঞ্চল কঠিন আগ্নেয়শিলা ও রূপান্তরিত শিলা দ্বারা গঠিত, ইহার ক্ষয়ীকরণ মন্থর এবং ভূ-ত্বক নগ্নীভূত। ভূগর্ভে বিভিন্ন শিলাস্তরে খনিজ সম্পদ থাকায়, আজিকার মানুষ খনিজ সম্পদ উদ্ধারে তৎপর। খনিজ শিল্প ও শ্রমশিল্প স্থানে স্থানে স্থাপিত হওয়ায় পরিবহণ ব্যবস্থা উন্নত ও পরিবহণে বহুলোক কর্মরত। (২) ভূ-ত্বকে নদীগুলি খরস্রোতা ও অগভীর। অধিকাংশ নদী **পূর্ববাহিনী**। জলসেচ ও জলবিদ্যুৎ উৎপাদনে নদীগুলির দান যথেষ্ট। কৃষি ও শ্রমশিল্পে দাক্ষিণাত্য উন্নত। (৩) দাক্ষিণাত্যের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চল **লাভা** বা **কৃষ্ণ মৃত্তিকা** দিয়া গঠিত। ক্ষয়িত লাভা হইতে উর্বর কাল মাটির সৃষ্টি হইয়াছে। ইহা ছাড়া দাক্ষিণাত্যের অনেকটা লাল

মাটি দিয়া ঢাকা। কালো ও লাল মাটিতে সার দেওয়ায় ও জলসেচ করায় উন্নত বীজে অধিক পরিমাণ ফসল উৎপন্ন হয়। কৃষিকার্য অগ্রগতির পথে। দীর্ঘ আঁশ বিশিষ্ট তুলা, অধিক শর্করা উৎপাদনক্ষম ইক্ষু ও বিশেষ বিশেষ তৈলবীজ অর্থাগমে সাহায্য করে। **ধান** প্রধান খাদ্যশস্য। দাক্ষিণাত্যে চাউল পর্যাপ্ত। স্থানবিশেষে উহা উদ্বৃত্ত থাকে। এখান হইতে রাষ্ট্রের ঘাট্‌তি রাজ্যে চাউল রপ্তানি হয়। এই অঞ্চলে কৃষিকর্ম ও পশু-পক্ষী পালন সমভাবে অগ্রগতির পথে থাকায় সুষম খাদ্যের অভাব নাই। (৪) দাক্ষিণাত্যে বৃষ্টিপাত অল্প। দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বাতাস পশ্চিমঘাট পর্বতমালায় বাধা পায়। বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে জমিতে জলসেচ করায় ফসল উৎপাদনের কোনরূপ অসুবিধা নাই। (৫) স্থানীয় পর্বতমালা ও মালভূমি বৃক্ষে আবৃত। অধিকাংশ ক্ষেত্রে বৃক্ষগুলি হইতে শক্ত কাষ্ঠ পাওয়া যায়। কাষ্ঠ সংগ্রহে ও উহার ব্যবসায়ে বহু লোক নিযুক্ত রহিয়াছে। দাক্ষিণাত্যের মালভূমি অঞ্চলে লোকবসতি খুব ঘন নহে।

অনুশীলনী

১। মহারাষ্ট্রে মালভূমির ভূগঠন বর্ণনা কর। এই ভূমি কি ভাবে উৎপন্ন হইয়াছে তাহাও বল।

২। দাক্ষিণাত্যের নদীগুলির প্রধান বৈশিষ্ট্য কি? হিমালয়ের নদীখাতগুলির সহিত এই নদীগুলির খাতের পার্থক্য কি?

৩। কোন্ নদীকে **'দাক্ষিণাত্যের গঙ্গা'** বলা হয়? এই নদীর উৎপত্তি ও পতনস্থানের নাম বল। নদীটির দৈর্ঘ্য কত?

৪। মহীশূর বা কর্ণাটক মালভূমির ভূগঠন বর্ণনা কর। ইহার পূর্বাংশকে **ময়দান** বলা হয় কেন?

৫। নীলগিরি পর্বত কিভাবে উৎপন্ন? এই পর্বতের প্রধান উৎপন্নদ্রব্য কি? এই পর্বতের দুইটি শৈলসহরের নাম কর।

৬। পালঘাট উপত্যকাটি কি ভাবে উৎপন্ন? এই উপত্যকার ভৌগোলিক গুরুত্ব কি?

৭। দাক্ষিণাত্য মালভূমিতে জলবিদ্যুৎ উৎপাদন অত্যাবশ্যক কেন? এখানকার প্রাচীনতম জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রটি কোথায় অবস্থিত? কয়না ও যোগ বিদ্যুৎকেন্দ্র দুইটির অবস্থান বর্ণনা কর।

৮। দাক্ষিণাত্য মালভূমির দুইটি বৃহৎ জলসেচ ব্যবস্থা বর্ণনা কর। এখানে কৃষিকার্যের জন্য জলসেচ প্রয়োজন হয় কেন?

৯। সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও ঃ—

পুণা, মহাবালেশ্বর, বাঙ্গালোর, কোলার, হায়দারাবাদ ও বিজওয়াড়া।

১০। ছোটনাগপুরের মালভূমিকে ভারতের খনিজ-ভাণ্ডার বলা হয় কেন? এই অঞ্চলের পাঁচটি বৃহৎ শিল্পকেন্দ্রের পরিচয় দাও।

১১। কর্ণাটকে ভদ্রাবতীতে লোহা কারখানা স্থাপনের সুবিধা ও অসুবিধাগুলি বর্ণনা কর।

১২। ভৌগোলিক কারণ নির্দেশ কর।

(ক) মহারাষ্ট্র তূলা চাষের জন্য বিখ্যাত। (খ) মধ্যপ্রদেশে একটি বড় নিউজপ্রিন্টের কারখানা স্থাপিত হইয়াছে। (গ) মুরীতে এলুমিনিয়াম কারখানা আছে। (ঘ) দাক্ষিণাত্যের অভ্যন্তরভাগ বসতিবিরল। (ঙ) কর্ণাটকে সেচখাল কাটা অসুবিধাজনক। (চ) কাবেরী নদীর গতিপথে বড় বড় জলবিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র আছে। (ছ) কর্ণাটক মালভূমির পশ্চিমাংশে সেগুন গাছের গভীর অরণ্য আছে। (জ) কেরালায় অনেক রবার বাগান আছে। (ঝ) কর্ণাটক রাজ্য কফি ও মশলা উৎপাদনে ভারতে সর্বশ্রেষ্ঠ। (ঞ) কর্ণাটক রাজ্যে শিল্পের জন্য শক্তির প্রধান উৎস জলবিদ্যুৎ।

১৩। দাক্ষিণাত্যের নদনদীর অধিকাংশ পূর্ববাহিনী কেন? (মা. প. ১৯৭৬)

১৪। ভারতবর্ষের প্রধান লৌহখনি অঞ্চল কোথায়? ঐ খনি অঞ্চলে কি কি শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে? (মা. প. ১৯৭৬)

১৫। ভারতের তিনটি প্রধান বিমান বন্দরের নাম লিখ। (মা. প. ১৯৭৬)
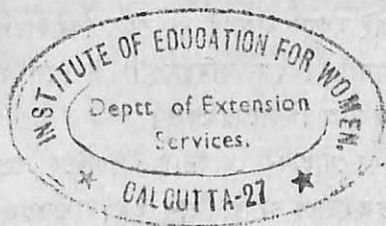
ষষ্ঠ পাঠ

পূর্ব-উপকূলের সমভূমি

(মহানদী, গোদাবরী, কৃষ্ণা ও কাবেরী নদীর মোহনা সহ)

সূচনা : দাক্ষিণাত্যের মালভূমি পূর্ব ও পশ্চিমদিকে নিম্ন সমভূমি দ্বারা ঘেরা। এই নিম্ন সমভূমি দাক্ষিণাত্যের তটভূমি। দাক্ষিণাত্যের তটভূমি উভয় উপকূলে বেশ দীর্ঘ। উহারা (১) পশ্চিম উপকূলের তটভূমি এবং (২) পূর্ব উপকূলের তটভূমি বলিয়া খ্যাত। উভয় তটভূমি উত্তরদিক হইতে দক্ষিণদিকে বিস্তৃত। পশ্চিম উপকূলের তটভূমি অপ্রশস্ত। স্থানে স্থানে উহা ৪০ কি. মি. অপেক্ষা অধিক প্রশস্ত নহে। পূর্ব-উপকূলের তটভূমির প্রস্থ কিছুটা বেশী। অনেক স্থানে উহা প্রায় ১৫০ কি. মি. প্রশস্ত। পূর্ব-উপকূলের তটভূমি নদী-বাহিত পলিমাটি দ্বারা গঠিত। এই কারণে উহার ভূমি অনেকটা উর্বর ও কৃষি উপযোগী। এই পাঠে আমরা পূর্ব-উপকূলের তটভূমির বিষয়ে আলোচনা করিব।

পূর্ব-উপকূলের তটভূমি কন্যাকুমারী হইতে উত্তর-পূর্বে সুবর্ণরেখা নদীর মোহনা পর্যন্ত বিস্তৃত। এই তটভূমি **মহানদী, গোদাবরী, কৃষ্ণা** ও **কাবেরী** নদী দ্বারা বিধৌত। নদীবাহিত পলল মৃত্তিকা দ্বারা গঠিত এই তটভূমি কৃষিকার্যে অগ্রণী। নদীমোহনায় উপকূলে ব-দ্বীপ রচিত হওয়ায় কৃষিকার্যের সুবিধা হইয়াছে।

স্থানীয় বৃষ্টিপাত কৃষির উপযোগী। কন্যাকুমারী হইতে কৃষ্ণা-গোদাবরী মোহনা পর্যন্ত **ক্ষেত** বা **খামার** দাক্ষিণাত্যের সমভূমি হইতে সমুদ্র পর্যন্ত প্রসারিত। সেখানে শস্যক্ষেত্রে খাদ্যশস্য ও অন্যান্য ভোগ্য ফসল উভয়ই উৎপন্ন হয়। পূর্ব-উপকূলে তটভূমিতে তাপমাত্রা ও বারিপাত মধ্যম। সেখানে বৎসরে দুইবার বৃষ্টি হয়। গ্রীষ্মের পর প্রায় ১০২ সে. মি. এবং তাহার পর শীতের আগে ঘূর্ণিবাতাসে অতিরিক্ত প্রায় ৫১ সে. মি. বৃষ্টিপাত হয়।

এই অঞ্চলে মাঝারি ও বৃহৎ শিল্পকারখানা স্থাপিত হওয়ায় বহু লোক শিল্প-কারখানায় নিযুক্ত রহিয়াছে। উপকূলে সমুদ্র অগভীর। মৎস্য শিকার সহজ। মাদ্রাজ মৎস্য শিকারের কেন্দ্র।

কৃষ্ণা-গোদাবরী মোহনার উত্তরদিকে যতই যাওয়া যায়, সমুদ্র হইতে পাহাড় উত্থিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। সুতরাং এইখানে তটভূমি বিলীন হইয়াছে। উহার পর সংকীর্ণ তটভূমি বিদ্যমান। তটভূমি অনেকস্থলে স্বাস্থ্যকর স্থানে পরিণত হইয়াছে।

পূর্ব-উপকূলের তটভূমি ঃ

পূর্ব-উপকূলের তটভূমি কৃষ্ণা-গোদাবরী মোহনা দ্বারা বিভক্ত। উত্তরের ভাগ **(ক) উত্তর সরকার** (Northern Circars) এবং দক্ষিণভাগ **(খ) করমণ্ডল তটভূমি** নামে পরিচিত।

পূর্ব ও পশ্চিম তটভূমি
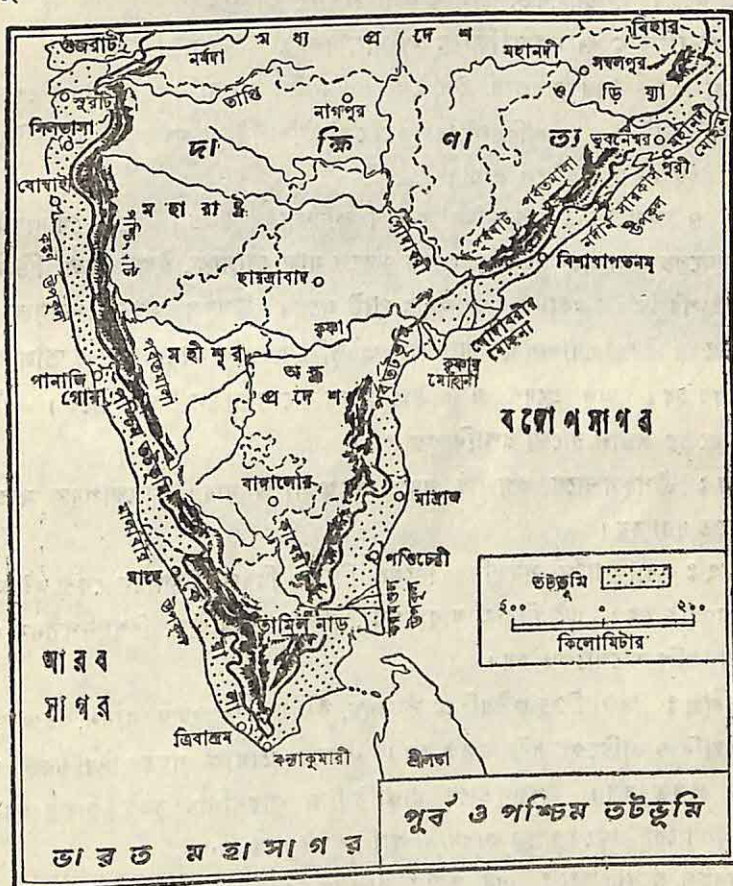
(ক) উত্তর সরকার (Northern Circars) তটভূমি ঃ

অবস্থান ও প্রকৃতি ঃ পূর্ব-উপকূলের উত্তর সরকার তটভূমি ওড়িষ্যা রাজ্যের বালেশ্বর, কটক, পুরী ও গঞ্জাম জিলাগুলির এবং অন্ধ্রপ্রদেশের শ্রীকাকুলাম, বিশাখাপত্তনম, পূর্ব গোদাবরী, পশ্চিম গোদাবরী, গুন্টুর ও নেলোর জিলাগুলির পূর্বাংশ লইয়া গঠিত। তটভূমির অনেকটা মহানদী, গোদাবরী, ও কৃষ্ণা নদীত্রয়ের মোহনা লইয়া রচিত।

জলবায়ু ঃ অঞ্চলটিতে মৌসুমী বাতাসে বৎসরে দুইবার বৃষ্টিপাত হয়। গ্রীষ্মের পর দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বাতাসে এবং শীতের প্রারম্ভে উত্তর-পূর্ব ও দক্ষিণ-পশ্চিম এই দুই মৌসুমী বাতাসের সংঘর্ষে ঘূর্ণিবাতে এখানে বৃষ্টি হয়।

উদ্ভিদ ঃ স্থানে স্থানে মৌসুমী ফলবৃক্ষ—আম, কাঁঠাল, জাম, পেয়ারা, নারিকেল ও সুপারী জন্মে। কেয়া, বেত, তাল ও কলা স্থানবিশেষে জন্মে।

অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিবেশ ঃ

অধিবাসী ঃ উত্তর সরকার উপকূলে অধিবাসীর সংখ্যা কম। স্থান বিশেষে লোকবসতি কিছুটা ঘন। অধিবাসীদের অনেকেই কৃষিজীবী ও মৎস্যজীবী। ওড়িয়া ও তেলেগু এই অঞ্চলের প্রধান ভাষা।

কৃষি ও জলসেচ ঃ তটভূমির ব-দ্বীপ কৃষিকার্যে উন্নত। কৃষ্ণা-গোদাবরী ব-দ্বীপে জলসেচ প্রথা প্রচলিত। জলসেচ অঞ্চলে **ধান, তামাক, ইক্ষু, তিল, তিসি ও ডাল** উৎপন্ন হয়। মহানদীর মোহনায় **পাট** জন্মে। উপকূল অঞ্চলে **খরমুজ ও তরমুজ** জন্মে। কৃষ্ণা-গোদাবরী মোহনায় তটভূমিতে কৃষি অঞ্চলে **ধান ও তামাক** প্রচুর উৎপন্ন হয়। অন্ধ্র প্রদেশ ও ওড়িষ্যা উভয় রাজ্যে চাউল উদ্বৃত্ত থাকে। এই চাউল ভারতের অন্যান্য রাজ্যে রপ্তানি করা হয়।

মৎস্য ঃ উপকূলভাগে অগভীর সমুদ্রে মৎস্য পাওয়া যায়। খাদ্যোপযুক্ত মৎস্য সমুদ্র হইতে ধরা হয়।

বিদ্যুৎ ঃ দাক্ষিণাত্য সমভূমির বিশেষ বিশেষ বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র হইতে বিদ্যুৎ সরবরাহ হয়। এই বিদ্যুৎ দ্বারা পুরী, গঞ্জাম, পারাদ্বীপ, বিশাখাপত্তনম ও অন্যান্য স্থানগুলি আলোকিত হয়।

শ্রমশিল্প ঃ অঞ্চলটিতে কুটীরশিল্পে তাঁতবস্ত্র, কাঁসা ও পিতলের বাসন, ইস্পাত নির্মিত যন্ত্রাদি ও নারিকেল দড়ি প্রস্তুত হয়। এখানে তামাক পাতা দিয়া চুরুট ও সিগারেট প্রস্তুত হয়। উপকূলভাগে মাঝারি শিল্প কারখানায় চুরুট প্রস্তুত হয়। বর্তমানে সিগারেট প্রস্তুতের বড় কারখানা স্থাপিত হইয়াছে।

পরিবহণ ও বাণিজ্য ঃ এই অঞ্চল রাজপথ, রেলপথ, জলপথ ও বিমানপথে রাষ্ট্রের নানা রাজ্যের সহিত যোগাযোগ রক্ষা করে। অঞ্চলটিতে **বিশাখাপত্তনম বন্দর** জলপথে পণ্য ও যাত্রী পরিবহণ করে। মহানদীর মোহনায় **পারাদ্বীপ** নামক বন্দরটি অল্পদিন যাবৎ চালু হইয়াছে। বন্দরটি খনিজ লৌহ, কয়লা ও অন্যান্য খনিজ ও বনজ সম্পদ রপ্তানি করে। ব্রডগেজ রেলপথে অঞ্চলটি কলিকাতা বন্দরের সহিত যুক্ত। দক্ষিণ-পূর্ব রেলপথ অঞ্চলটির মধ্য দিয়া উত্তর-পূর্ব হইতে দক্ষিণ-পশ্চিমে ও দক্ষিণে গিয়াছে। **মাসুলিপত্তনম ও কাকিনাড়া** এই অঞ্চলের অপর দুইটি মাঝারি বন্দর।

প্রসিদ্ধ স্থান ঃ **পুরী**—সমুদ্রতীরে অবস্থিত স্বাস্থ্যকর শহর ও প্রসিদ্ধ হিন্দুতীর্থ। এখানকার জগন্নাথ মন্দির প্রসিদ্ধ। এখানে বহু পর্যটক সারা বৎসর যাতায়াত করে।
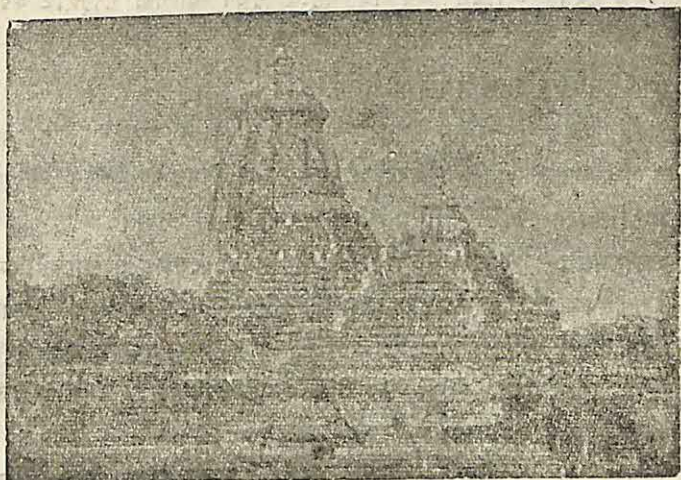
পুরীর জগন্নাথ মন্দির

বিশাখাপত্তম—উপকূলের বন্দর। এই বন্দরের একপাশে হিন্দুস্থান শিপ্ইয়ার্ড জাহাজ-নির্মাণের কেন্দ্র। এখানে সমুদ্রগামী জাহাজ নির্মিত হয়। গড়ে প্রতি বৎসর দুইটি জাহাজ প্রস্তুত হয়। **গঞ্জাম, গোপালপুর, বহরমপুর** ও **বালেশ্বর**—অপর চারিটি স্বাস্থ্যকর স্থান হিসাবে উল্লেখযোগ্য।

(খ) করমণ্ডল তটভূমি ঃ

অবস্থান ও ভূপ্রকৃতি ঃ তামিলনাড়ু রাজ্যে এই তটভূমির প্রস্থ বেশ অধিক। কাবেরী ব-দ্বীপ ও পেন্নার নদী মোহনা এই তটভূমির অংশ মাত্র। তিরুনেলভেলি, রামনাথপুরম, তাঞ্জোর, দক্ষিণ আর্কট ও চিঙ্গলেপুত জিলাগুলির পূর্বাংশ ও পণ্ডিচেরী লইয়া করমণ্ডল উপকূল গঠিত।

অঞ্চলটিতে জলসেচ প্রথা প্রচলিত থাকায় কৃষিকার্য সহজ হইয়াছে। পশ্চিমভাগে নগ্নীভূত অথচ বিচ্ছিন্ন পূর্বঘাট পর্বত তটভূমিকে মালভূমি হইতে পৃথক করিয়াছে।

জলবায়ু ঃ করমণ্ডল উপকূলে বিশেষতঃ উত্তরভাগে বৎসরে দুইবার বৃষ্টিপাত হয়। গ্রীষ্মের পর বর্ষায় দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বাতাসে বৃষ্টি হয়। শীতের প্রারম্ভে ঘূর্ণিবাতে বারিপাত হয়। মোট বারিপাত ১৪৭ সে. মি.।

উদ্ভিদ ঃ উপকূলে নারিকেল বৃক্ষ ও সুপারী গাছের উপবন দেখা যায়। ব-দ্বীপে কেয়া ও গরাণ প্রভৃতি জলাভূমির গাছ জন্মে।

খনিজ ও জলজ সম্পদ ঃ তাঞ্জোর ও দক্ষিণ আর্কট লিগনাইট, চূণাপাথর ও খনিজ লৌহের জন্য প্রসিদ্ধ। তাঞ্জোর জিলায় গ্রাফাইট ও জিপ্সাম খনি হইতে উত্তোলিত হয়। উপকূলে অগভীর সমুদ্রে মুক্তা ও শঙ্খ সংগৃহীত হয়। উপকূলে মৎস্য শিকার বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে সাধিত হয়।

অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিবেশ ঃ

অধিবাসী ঃ করমণ্ডল উপকূলে অধিবাসীর সংখ্যা কম। বন্দর অঞ্চলে অধিক লোক বাস করে। অধিবাসীদের অনেকেই নৌ-বিদ্যায় পারদর্শী। উহারা কৃষিকার্যে ও মৎস্য শিকারে রত। তামিল এই অঞ্চলের প্রধান ভাষা।

জলসেচ ঃ করমণ্ডল উপকূলে কাটা খালে পেন্নার ও কাবেরী নদীদ্বয়ের জল বহাইয়া খেতখামারে সেচ করা হয়। তটভূমির কৃষি সেচের উপর নির্ভরশীল।

কৃষি ঃ তটভূমিতে বিশেষতঃ ব-দ্বীপ অঞ্চলে জলসেচ জমিতে ধান, বিমলী পাট, ইক্ষু, ডাল, গোলমরিচ, এলাচ, তামাক ও লঙ্কা উৎপন্ন হয় ; নদী অধিত্যকায় তিল, রেড়ী ও তিসি জন্মে।

বিদ্যুৎ ও শ্রমশিল্প ঃ মাদ্রাজ শহরে বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়। উপকূলের শহর অঞ্চলে দাক্ষিণাত্য মালভূমির তামিলনাড়ু রাজ্যের বিদ্যুৎকেন্দ্র হইতে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হয়। তটভূমিতে লবণ প্রস্তুত হয়। নেভেলিতে কোকচুল্লী কার্যকরী রহিয়াছে। তাঁতশিল্পে কার্পাস বস্ত্র ও রেশম বস্ত্র প্রস্তুত হয়। মাদ্রাজ অঞ্চলে বয়নশিল্প, সিগারেট ও চুরুট কারখানা ও চিনির কল প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে।

পরিবহণ ও বাণিজ্য ঃ রেলপথে মাদ্রাজ প্রান্তিক ষ্টেশন। দক্ষিণ রেলপথে উহা ব্রডগেজে কলিকাতা ও নাগপুর এবং মিটার গেজে বোম্বাই, মহীশূর, ত্রিবান্দ্রাম ও সেকেন্দ্রাবাদ। শহরের সহিত যোগাযোগ রাখে। রাজপথ তটভূমির সর্বত্র প্রসারিত রহিয়াছে জলপথে মাদ্রাজ বিশেষ বন্দর। সমুদ্রগামী জাহাজ মাদ্রাজ বন্দরের অনতিদূরে নোঙর ফেলে।

রপ্তানী সামগ্রীর মধ্যে মাছ, ডিম, নারিকেল, কার্পাসবস্ত্র, কৃষিজ তৈল, চন্দন-তৈল ও মসলা ইত্যাদি প্রধান। আমদানী সামগ্রী বলিতে যন্ত্রপাতি, ঔষধ, পাটজাত সামগ্রী, বিলাসদ্রব্য, যানবাহন ও ইস্পাত সামগ্রীকে বুঝায়।

প্রসিদ্ধ স্থান ঃ মাদ্রাজ—বিখ্যাত বন্দর ও তামিলনাড়ু রাজ্যের রাজধানী। বন্দরটি অগভীর উপকূলে স্থাপিত। অনেক সময় জাহাজ বন্দর পর্যন্ত আসিতে পারে না। এখানে হাইকোর্ট ও বিশ্ববিদ্যালয় আছে। **তাঞ্জোর**—কার্পাস শিল্পের কেন্দ্র। **তুতিকোরিন, নাগাপাত্তিনাম, কাঞ্চিপুরম (চিঙ্গলেপুত) ও কুড্ডালোর** অপর কয়েকটি ছোট বন্দর। **পণ্ডিচেরী**—বন্দর ও নগর। এখানে শ্রীঅরবিন্দের আশ্রম

রহিয়াছে। **কন্যাকুমারী** ও **রামেশ্বরম**—হিন্দুদের তীর্থস্থান। সম্প্রতি রামেশ্বরমে স্বামী বিবেকানন্দের প্রস্তরমূর্তি স্থাপিত হইয়াছে।

দ্বীপ ঃ পূর্ব উপকূলের পূর্বদিকে দূর সমুদ্রে **আন্দামান-নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ**—কেন্দ্রীয় সরকারের শাসনাধীন। দ্বীপগুলিতে ধান, রবার ও কফি উৎপন্ন হয়। নারিকেল বৃক্ষ, সুপারী বৃক্ষ, অন্যান্য ফলবৃক্ষ ও চিরহরিৎ বৃক্ষ স্বাভাবিক অবস্থায় জন্মে। বনভূমির আয়তন মোট জমির ৯০ শতাংশ। দ্বীপপুঞ্জের মোট আয়তন প্রায় ৮৩ হাজার বর্গকিলোমিটার। লোক সংখ্যা এক লক্ষের অধিক। **পোর্ট ব্লেয়ার**—রাজধানী।

প্রশ্ন

১। পূর্ব-উপকূলের তটভূমির প্রাকৃতিক বিবরণ লিখ।

২। পূর্ব-উপকূলের তটভূমিকে কয়টি ছোট অঞ্চলে ভাগ করা যায়? এই অঞ্চলের প্রধান বন্দরগুলির নাম লিখ।

৩। পূর্ব-উপকূলের কৃষি, জলসেচ, বিদ্যুৎ ও শ্রমশিল্পের বিবরণ দাও।

৪। পূর্ব-উপকূলের জলবায়ু ও উদ্ভিদ সম্বন্ধে যাহা জান লিখ।

সপ্তম পাঠ

পশ্চিম উপকূলের সমভূমি

(Western Coastal Plains)

সূচনা ঃ পশ্চিম উপকূলের তটভূমি কেন্দ্রশাসিত গোয়া অঞ্চল দিয়া দুইভাগে বিভক্ত। উত্তর ভাগের তটভূমি **(ক) কঙ্কণ উপকূল** এবং দক্ষিণভাগের তটভূমি **(খ) মালাবার উপকূল** বলিয়া খ্যাত। পশ্চিম উপকূলের তটভূমির পূর্বপার্শ্বে পশ্চিমঘাট পর্বতমালা সমুদ্র হইতে অনেকটা খাড়াইভাবে দণ্ডায়মান। এই স্থানে নদী বিরল। দক্ষিণভাগে পশ্চিমঘাট, নীলগিরি, আন্নামালাই ও কার্ডামম পর্বতমালার মধ্যে গিরিপথ বিরাজমান। এই অংশে কয়েকটি নদী পশ্চিমঘাট পর্বত ছেদ করিয়া পশ্চিমবাহিনী। উহাদের মধ্যে কেরল রাজ্যের **পেরিয়ার নদী** বিশেষ উল্লেখযোগ্য। খাড়াই পশ্চিমঘাট পর্বতমালায় দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বাতাস বাধা পাওয়ায় উহার পশ্চিমদিকে প্রচুর বারিবর্ষণ হয়। পশ্চিম উপকূলের উত্তরভাগ নর্মদা ও তাপ্তী নদী দুইটি দ্বারা বিধৌত। নদীমোহনায় তটভূমি পলল মৃত্তিকা দ্বারা গঠিত। দক্ষিণে গোয়া পর্যন্ত তটভূমি কঠিন শিলা দিয়া গড়া। উহার দক্ষিণে তটভূমি সমুদ্র দ্বারা

বিধ্বস্ত। স্থানে স্থানে উপকূলে তটভূমির মধ্যে হ্রদের সৃষ্টি হইয়াছে। ঐগুলিকে **লেগুন** বলে। এই অঞ্চলে বারিপাত বেশ অধিক এবং দীর্ঘকাল স্থায়ী; তাপ সামুদ্রিক ভাবাপন্ন। পশ্চিম উপকূলের তটভূমির দক্ষিণভাগে **পেরিয়ার নদী** প্রসিদ্ধ। এই অঞ্চলে ভূ-ত্বকের কঠিন শিলা মৃত্তিকা দ্বারা আচ্ছাদিত।

পশ্চিম উপকূলে তটভূমির ঠিক পশ্চিমে সমুদ্র অত্যন্ত গভীর। এখানকার তটভূমি সমুদ্রতলে যেন সোজাসুজি ভাবে দাঁড়াইয়া আছে। তাই পশ্চিম উপকূলের তটভূমিতে বন্দরের সংখ্যা কম। পশ্চিম উপকূলের তটভূমির উত্তর ভাগে বন্দর গঠনের সুযোগ থাকায় **পাঞ্জিম, বোম্বাই ও সুরাট** এই তিনটি বিখ্যাত বন্দর বিদ্যমান।

(ক) কঙ্কণ তটভূমি :

অবস্থান ও ভূপ্রকৃতি : গুজরাট রাজ্যে কয়রা জিলার দক্ষিণাঞ্চল এবং ব্রোচ ও সুরাট জিলার পশ্চিমভাগ এবং মহারাষ্ট্র রাজ্যের বোম্বাই সহ থানা, কোলাবা ও রত্নগিরি জিলা তিনটির পশ্চিমাংশ এবং গোয়া রাজ্যের পশ্চিমাংশ লইয়া কঙ্কণ উপকূল গঠিত।

জলবায়ু : কঙ্কণ উপকূলে বারিপাত অধিক। বার্ষিক বারিপাত প্রায় ২৪৫ সে. মি.। তাপ মধ্যম। এইখানকার জলবায়ু সামুদ্রিক ভাবাপন্ন মৌসুমী। বৎসরে ছয় মাস শুষ্ক।

উদ্ভিদ ও জীবজন্তু : উপকূলে কঠিন শিলাখণ্ডে গাছপালা কম জন্মে। স্থান বিশেষে নারিকেল ও মৌসুমী বৃক্ষ জন্মে। এই অঞ্চলে জীবজন্তু যৎসামান্য।

খনিজ সম্পদ : কঙ্কণ উপকূলে খনিজ তেলের আকর আছে। বর্তমানে কাম্বে ও অঙ্কলেশ্বরে খনিজ তৈল উত্তোলিত হয়। গোয়ায় খনিজ তৈলের ও লৌহের আকর বিদ্যমান। আরব সাগরে বোম্বে হাই খনিজ তৈলের এক বিশেষ আকর। এখানে বর্তমানে বাণিজ্যিক হিসাবে খনিজ তৈল উত্তোলন করা হইতেছে।

অর্থ নৈতিক ও সামাজিক পরিবেশ :

অধিবাসী : কঙ্কণ উপকূলে লোকবসতির ঘনত্ব উত্তর ও মধ্য ভাগে অধিক। দক্ষিণভাগে মধ্যম। কৃষিকার্য, শিল্প কারখানা ও পরিবহণ এই অঞ্চলের অধিবাসীদের জীবিকা অর্জনের পথ সুগম করিয়াছে। বহু লোক নানাভাবে এখানে কর্মরত। অঞ্চলটিতে দেশ-বিদেশের পর্যটক যাতায়াত করে।

কৃষি ও জলসেচ : কঙ্কণ-তটভূমির উত্তরভাগে গুজরাট রাজ্যে নদীমোহনায় ধান, গম ও ছোলা প্রভৃতি কৃষিজ ফসল উৎপন্ন হয়। গুজরাট সমভূমিতে জলসেচ হয়।

বিদ্যুৎ ও শ্রমশিল্প : দক্ষিণভাগে বিশেষতঃ মহারাষ্ট্রে তটভূমি সাংস্কৃতিক পরিবেশ রচনা করিয়াছে। এখানে বোম্বাই শহর, থানা ও কোলাবা শ্রমশিল্পে ও

বাণিজ্যে উন্নত। এখানে বহু লোকের বাস। রত্নগিরির কঠিন শিলাস্তূপ জনহিতকর কার্যের অন্তরায়।

পরিবহণ ও বাণিজ্যঃ পশ্চিমতটভূমির **থলঘাট** ও **ভোরঘাট** গিরিপথ পরিবহণে ও জলবিদ্যুৎ উৎপাদনে সহায়তা করে। **বোম্বাই** বন্দর যেমন জলপথে যোগাযোগ রাখে, তেমনি স্থলপথে দেশের মধ্যে রেলপথ ও রাজপথ যোগাযোগ রক্ষা করে। বোম্বাইয়ের অনতিদূরে **সান্তাক্রুজ** দেশের আন্তর্জাতিক বিমানঘাঁটি। সেখানে দেশের ও বিদেশের বিমানপোতসমূহ উঠানামা করে।

প্রসিদ্ধ স্থান ঃ বোম্বাই—মহারাষ্ট্র রাজ্যের রাজধানী ও রাষ্ট্রের বিখ্যাত বন্দর। ইহা খুব বৃহৎ নগর। এখানকার রাজপথ প্রশস্ত ও অট্টালিকা সুউচ্চ। এই নগরে অনেকগুলি দর্শনীয় স্থান আছে। তন্মধ্যে 'গেটওয়ে অব ইণ্ডিয়া' অথবা 'ভারতের তোরণদ্বার' বিখ্যাত বৃহৎ তোরণ। ইহা সমুদ্রসৈকতে নির্মিত। এইটি দেখার জন্য এই স্থানে পর্যটকগণের সমাগম হয়। এই স্থান হইতে মোটর-চালিত নৌকায় হস্তি-গুহা দেখার জন্য যাওয়া যায়। বোম্বাই শহরের দোলায়মান উদ্যান, চিড়িয়াখানা, যাদুঘর, জলজ প্রাণী সংরক্ষণ স্থান ও কৃত্রিম সরোবর প্রভৃতি অন্যান্য দ্রষ্টব্য স্থান। বোম্বাই এক বিশাল শিল্পনগর। ইহা বয়নশিল্পের বৃহৎ কেন্দ্রগুলির অন্যতম। এখানে সবাক ছায়াছবি নির্মাণের অনেকগুলি 'স্টুডিও' আছে। উপকূলের অনতিদূরে **ট্রম্বে** দ্বীপে দুইটি তৈল শোধনাগার ও একটি আণবিক বিজ্ঞান গবেষণাগার স্থাপিত হইয়াছে। **পানাজি**—কেন্দ্রশাসিত গোয়া অঞ্চলের রাজধানী। **ভাস্কোডাগামা**—গোয়ার প্রধান বন্দর। **মারমাগাওঁ**—গোয়ার একটি সামুদ্রিক বন্দর ও স্বাভাবিক পোতাশ্রয়।

(খ) মালাবার তটভূমিঃ

অবস্থান ও ভূপ্রকৃতিঃ কর্ণাটক রাজ্যের উত্তর ও দক্ষিণ কানাড়া জিলা দুইটির পশ্চিমাংশ এবং কেরল রাজ্যের কাগাবাগোদ, মালাবার, ত্রিচুর, কোট্টায়াম, কুইলন ও ত্রিবান্দ্রাম জিলা ছয়টির পশ্চিমাংশ লইয়া ইহা গঠিত। সমুদ্রের সহিত উপকূলের হ্রদগুলির যোগাযোগ থাকায় উহারা **'লেগুন'**। বর্তমানে এই সব স্থানে অল্প খরচে লবণ প্রস্তুত হয়।

জলবায়ুঃ মালাবার উপকূলে বৎসরে নয় মাসে প্রায় ২৫৪ সেঃ মিঃ বৃষ্টি হয়। জলবায়ু সামুদ্রিক ভাবাপন্ন মৌসুমী।

উদ্ভিদঃ পর্বতগাত্র চিরহরিৎ **মেহগিনি** ও **চন্দন** বৃক্ষে ঢাকা। স্থানে স্থানে **সেগুন** গাছ দেখা যায়। অঞ্চলটিতে চাষ ছাড়াই স্বাভাবিকভাবে **গোলমরিচ,**

এলাচ ও **দারুচিনি** জন্মে। **নারিকেল** ও **সুপারি** বৃক্ষের সারি দিয়া তটভূমি সাজান। দক্ষিণভাগে সুপারি ও নারিকেল বৃক্ষের উপবন সমুদ্র পর্যন্ত নামিয়া গিয়াছে।

জীবজন্তু ঃ পশ্চিম উপকূলের তটভূমি সুরাট হইতে দক্ষিণ দিকে কন্যাকুমারী পর্যন্ত বিস্তৃত। কঙ্কণ ও মালাবার উপকূলে সমুদ্রে মৎস্যশিকার বিজ্ঞানসম্মত নীতিতে গড়িয়া উঠে নাই। উপকূলে সমুদ্র গভীর এবং উপকূল সরল ও খাড়াই। বন্দর গঠনে উহা প্রাকৃতিক অন্তরায়।

খনিজ সম্পদ ঃ মালাবার তটভূমির পূর্ব ভাগে খনিজ সামগ্রী **মোনাজাইট, সোডিয়াম** ও **বক্সাইট** খনি হইতে উত্তোলিত হয়।

অর্থ নৈতিক ও সামাজিক পরিবেশ ঃ

অধিবাসী ঃ মালাবার উপকূলে লোকবসতি কেরল রাজ্য ছাড়া মধ্যম। কেরলরাজ্যে তটভূমি ঘনবসতিপূর্ণ। তটভূমির লোকেরা কানাড়ী, মালয়ালাম ও তামিল ভাষাভাষী। বহু লোক ইংরাজীতে কথা বলে। লোকেরা নৌবিদ্যায় পারদর্শী ও কষ্টসহিষ্ণু।

কৃষি ঃ স্থানীয় পর্বতগাত্রে আবাদী চাষ থাকায় **কফি, চা, রবার** ও **মশলা** উৎপন্ন হয়। ঐগুলি পণ্যদ্রব্য।

শ্রমশিল্প ঃ এখানকার উপকূলে **লবণ** প্রস্তুত হয়। উহা রসায়ন শিল্পের কাঁচামাল। পূর্বভাগে অঞ্চলটির আশপাশ শ্রমশিল্পের কর্ম-কোলাহলে মুখরিত। সিমেণ্ট, বৈদ্যুতিক যন্ত্রাদি, বস্ত্র, চিনি, রসায়ন সামগ্রী, রবার সামগ্রী, দড়ি, নারিকেল তৈল ও কাঠের জিনিস কারখানায় প্রস্তুত হয়। এই অঞ্চলে তৈলশোধনাগার অচিরে প্রতিষ্ঠালাভ করিবে।

পরিবহণ ও বাণিজ্য ঃ উভয় তটভূমি রাজপথে, রেলপথে ও জলপথে যোগাযোগ রক্ষা করে। দক্ষিণ ভাগে বন্দরের সংখ্যা কম। মালাবার উপকূল দিয়া দড়ি, নারিকেল তৈল, রবার, মসলা ও লবণ রপ্তানি হয়। পণ্যসামগ্রী বলিতে বস্ত্র, যন্ত্রপাতি, ধাতুসামগ্রী ও খাদ্যসামগ্রী প্রধান।

প্রসিদ্ধ স্থান ঃ **ত্রিবান্দ্রাম**—কেরল রাজ্যের রাজধানী। **কোচিন** ও **ম্যাঙ্গালোর**—প্রসিদ্ধ বন্দর। **কুইলন, এ্যালেপ্পি** ও **ম্যাঙ্গালোর**—বন্দরত্রয় জলপথে পরিবহণে ততটা সহায়তা করে না।

দ্বীপপুঞ্জ ঃ পশ্চিম উপকূলের অনতিদূরে আরব সাগরে অবস্থিত **লাক্ষা, মিনিকয়** ও **আমিনাদিভি** প্রভৃতি দ্বীপপুঞ্জের মধ্যে দশটিতে মনুষ্যবাস সম্ভব হইয়াছে। লোকসংখ্যা প্রায় ৩২ হাজার। আয়তনে দ্বীপগুলি ৩২ হাজার বর্গ কিলোমিটার।

এখানে নারিকেল বৃক্ষ স্বাভাবিক অবস্থায় জন্মে। নারিকেল রপ্তানি করা হয়। ধানচাষ পরীক্ষামূলকভাবে শুরু হইয়াছে।

মৎস্য শিকার অন্যতম উপজীবিকা। সন্নিহিত জলরাশি মৎস্য শিকারের উপযুক্ত ক্ষেত্র। অধিবাসীরা অনেকেই নারিকেলের দড়ি প্রস্তুত করে। দ্বীপগুলি বিদ্যুৎ দ্বারা আলোকিত। **কাওয়ারাথি** রাজধানী।

উভয় তটভূমির প্রভাবঃ (১) পশ্চিম-উপকূলের তটভূমিতে ছয় হইতে নয় মাস কাল বৃষ্টিপাত হয়। পূর্ব-উপকূলের তটভূমিতে বৎসরে **দুইবার** বারিপাত হয়। প্রথমটি গ্রীষ্মকালের ঠিক পরে এবং দ্বিতীয়টি শীতের প্রারম্ভে। (২) উভয় তটভূমির উপকূলে মৎস্য শিকার করা হয়। তবে পূর্ব উপকূলে মৎস্য শিকারের সুযোগ সুবিধা অধিক। স্থানে স্থানে সমুদ্রে মুক্তা পাওয়া যায়। (৩) পূর্ব-উপকূলের তটভূমি উর্বর। তাপমাত্রা ও বারিপাত কৃষির উপযোগী। জলসেচ অঞ্চলে খাদ্যশস্য ও অন্যান্য ভোগ্য ফসল উৎপন্ন হয়। পশ্চিম-উপকূলের আবাদী অঞ্চলে রবার, মশলা নারিকেল, চা ও কফি উৎপন্ন হয়। (৪) উভয় তটভূমির স্থানে স্থানে জনহিতকর কার্যে ও বাণিজ্যিক কোলাহলে মুখরিত অঞ্চলে লোকবসতি বেশ ঘন; অন্যত্র উহা স্বল্প।

অনুশীলনী

১। পূর্ব ও পশ্চিম উপকূলের প্রধান পার্থক্য কি? মালাবার উপকূলের প্রধান বৈশিষ্ট্য কি? এই উপকূলে কৃষিকার্য সম্বন্ধে যাহা জান লিখ।

২। পূর্ব উপকূলের কোন্ অংশ তূলা চাষের উপযুক্ত? সেখানে তূলা চাষের কি কি সুবিধা আছে? ঐ অঞ্চলের বস্ত্রশিল্প কেন্দ্রগুলির নাম উল্লেখ কর।

৩। পশ্চিম উপকূলে বৃহৎ বন্দর গঠনের পক্ষে কি কি অসুবিধা আছে? সেখানকার যে কোন একটি ছোট বন্দরের অবস্থান বর্ণনা কর।

৪। পশ্চিম উপকূলের বৃষ্টিপাত ও উদ্ভিদ বর্ণনা কর।

৫। কৃত্রিম পোতাশ্রয় কাহাকে বলে? পূর্ব উপকূলের কোন বন্দরে কৃত্রিম পোতাশ্রয় আছে?

৬। পশ্চিম উপকূলের খনিজ দ্রব্যগুলি কি কি ও কোথায় পাওয়া যায়?

৭। ভারতের তটভূমির বিভিন্ন অংশের নাম কর। পশ্চিম উপকূলকে বিভিন্ন অংশে ভাগ করার সপক্ষে ভৌগোলিক কারণ দেখাও।

৮। ভৌগোলিক কারণ ব্যাখ্যা কর: (ক) বোম্বাই ভারতের বৃহত্তম নগর। (খ) বিশাখাপত্তনম হইতে লৌহ আকরিক রপ্তানী হয়। (গ) ম্যাঙ্গালোর বন্দর

মসলা ও কাঠ রপ্তানী করে। (ঘ) মাদুরাই একটি বৃহৎ বস্ত্রশিল্প কেন্দ্র। (ঙ) কেরালা রাজ্যে উৎকৃষ্ট অভ্যন্তরীণ জলপথ আছে। (চ) পূর্ব উপকূলে বিস্তীর্ণ ব-দ্বীপ দেখা যায়। (ছ) কাবেরী ব-দ্বীপ কৃষিকার্যে অত্যন্ত উন্নত। (জ) সহ্যাদ্রির পশ্চিম ঢালে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়। (ঝ) ট্রম্বেতে দুইটি তৈল শোধনাগার আছে। (ঞ) গুজরাট রাজ্য বস্ত্রশিল্পে উন্নত। (ট) কোচিনে জাহাজ নির্মাণ কেন্দ্র স্থাপিত হইতেছে।

৯। সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাওঃ আলেপ্পি, পানাজি আঙ্কলেশ্বর, সাণ্টাক্রুজ, ভোরঘাট, কুইলন, মিনিকয়।

অষ্টম পাঠ

ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা

সূচনা ঃ উত্তর ভারতের মধ্য-সমভূমির পূর্বাংশে নিম্ন গাঙ্গেয় সমভূমি অঞ্চলের পূর্বে অবস্থিত ব্রহ্মপুত্র নদ এবং উহার উপনদী বিধৌত অঞ্চল **ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা** নামে অভিহিত। **ব্রহ্মপুত্র নদ** তিব্বতের মানস সরোবরের নিকট হইতে উৎপত্তিলাভ করিয়া হিমালয় পর্বতমালার উত্তর এবং তিব্বত মালভূমির দক্ষিণ দিক দিয়া **সানপু** (Tsang-po) নামে পূর্বমুখে প্রবাহিত হইয়াছে। তারপর পূর্ব-হিমালয়ের উত্তর-পূর্ব সীমান্তের পর্বতশ্রেণী ছেদ করিয়া উহা দক্ষিণাভিমুখে ভারতের রাজ্য অরুণাচল প্রদেশের এলাকার ভিতর প্রবেশ করিয়াছে। অরুণাচল অতিক্রম কালে দিবং ও লোহিত নামে দুইটি নদী ইহার সহিত মিলিত হইয়া পশ্চিমাভিমুখে প্রবাহিত হইয়া উত্তর ভারতের মধ্যে সমভূমির পূর্ব প্রান্তে আসাম রাজ্যে প্রবেশ করার পরই **ব্রহ্মপুত্র নদ** নামে পরিচিত হইয়াছে। অতঃপর পশ্চিম-বাহিনী নদীটি আসাম রাজ্যের ডিব্রুগড়, লক্ষীমপুর, শিবসাগর, দরং, নওগাঁ, কামরূপ ও গোয়ালপাড়া জিলা-সমূহের ভিতর দিয়া প্রবাহিত হইয়া মেঘালয় রাজ্যের গারো পাহাড় জিলার উত্তর-পশ্চিম প্রান্ত পর্যন্ত আসিয়া দক্ষিণবাহিনী হইয়া বিদেশী রাষ্ট্র বাংলাদেশে প্রবেশ করিয়াছে। এই পাঠে আসাম রাজ্যের ব্রহ্মপুত্র নদ ও উহার উপনদী বিধৌত অঞ্চলটি সম্বন্ধে আমরা আলোচনা করিব। এই অঞ্চলে **সুবর্ণশ্রী, ডিক্রং, মানস, চম্পামতী, গদাধর ও বরনদী** ব্রহ্মপুত্রের দক্ষিণ তীরের প্রধান উপনদী। **বুড়ীদিহিং, দিসাং, ধনশ্রী ও কপিলি** নদী ব্রহ্মপুত্রের বাম তীরের প্রধান উপনদী।

অবস্থান ও ভু-প্রকৃতি ঃ ব্রহ্মপুত্র নদ ও উহার উপনদী বিধৌত অঞ্চল লইয়া ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা গঠিত। আসাম রাজ্যে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা দৈর্ঘ্যে প্রায় ৮২০ কি.মি.,

কিন্তু প্রস্থে উহা প্রায় ৮২ কি. মি.। এই অঞ্চলটির ভূ-গঠন কতকটা নৌকার মত—উত্তর ও দক্ষিণ ভাগ উঁচু, এবং মধ্য অংশ নীচু। উহা উত্তর ভারতের মধ্য-সমভূমি অঞ্চলের অন্তর্গত হইলেও বিশাল গাঙ্গেয় সমভূমি ও উপত্যকার মধ্যে অনেক পার্থক্য বিদ্যমান। এই উপত্যকাটি স্থানীয় অধিবাসীদের দ্বারা **আসাম উপত্যকা** নামেও অভিহিত হয়। এই উপত্যকা উত্তরদিকে পূর্ব-হিমালয় পর্বতমালা এবং দক্ষিণদিকে উত্তর পূর্ব সীমান্ত পর্বতশ্রেণীর বা আসাম পর্বতমালার মধ্যে অবস্থিত। বর্তমানে রাজ্য পরিসীমা পুনর্বিন্যাসের ফলে আসাম রাজ্যটি প্রকৃতপক্ষে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকাতেই সীমাবদ্ধ। উপত্যকায় প্রবহমান-কালে ব্রহ্মপুত্র নদের স্রোত অনেক স্থলে দুই ধারায় প্রবাহিত হইয়া কিছুদূর গিয়া মিলিত হইয়াছে। উপত্যকাটি ২৫°৩০´ উঃ—২৮´ উঃ অক্ষাংশের এবং ৮৯°৫৬´ পূঃ—৯৫°৫০´ পূঃ দ্রাঘিমাংশের মধ্যে অবস্থিত। আয়তনে উপত্যকাটি কিঞ্চিদধিক ৫৬ হাজার বর্গ কি. মি.।

ব্রহ্মপুত্র নদটি বিশাল। ইহার উভয় তীরে অনেক স্থানে গভীর অরণ্য ও অনাবাদী জলাভূমির অংশ রহিয়াছে। কিন্তু নদ হইতে অল্প দূরেই সমতলভূমি। উহাতে ধান ও পাট ইত্যাদির চাষ হয়। ধানক্ষেতগুলির মধ্যে স্থানে স্থানে উপবন ও গ্রাম বিদ্যমান রহিয়াছে। উপত্যকার সাধারণ ঢাল পূর্ব হইতে পশ্চিম দিকে। সমগ্র উপত্যকা পলিমাটি দিয়া গড়া। পলিমাটি উদ্ভিদ খাদ্যপ্রাণে পরিপূর্ণ। উপত্যকার উত্তর ও দক্ষিণ ভাগ সামান্য ঢালযুক্ত। উত্তর দিকের ঢাল হিমালয় পর্বতমালা হইতে এবং দক্ষিণ দিকের ঢাল মিকির পাহাড় ও খাসিয়া পাহাড় হইতে ক্রমশঃ উপত্যকার সমতলে মিশিয়াছে।

জলবায়ু : এই উপত্যকায় মৌসুমী জলবায়ু বিরাজিত। উপত্যকার পূর্বভাগে তাপমাত্রা ও বারিপাত চরমভাবাপন্ন। শীতকালে তাপমাত্রা বেশ কম এবং গ্রীষ্মকালে তাপমাত্রা খুব প্রখর। এই উপত্যকার অধিকাংশ স্থানে বৃষ্টিপাত ২০০ সেন্টিমিটারের চেয়ে বেশী। কিন্তু মধ্যস্থলে একটি শুষ্ক অঞ্চল রহিয়াছে। এই শুষ্ক ভূভাগটি গারো-খাসিয়া-জয়ন্তিয়া পাহাড়ের **বৃষ্টিচ্ছায়া** অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত। এই পাহাড়শ্রেণী উপত্যকাকে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ু প্রবাহ হইতে রক্ষা করে। গ্রীষ্মে ও বর্ষায় আকাশ মেঘাবৃত থাকে। কাজেই এই অঞ্চলটি প্রশস্ত গাঙ্গেয় সমভূমির মত তত উত্তপ্ত হয় না। ইহা ভারতের আর্দ্রতম অঞ্চল।

উদ্ভিদ : সারা বৎসর এই অঞ্চলের বাতাস আর্দ্রভাবাপন্ন। এই কারণে বনভূমিতে ক্রান্তীয় চির-হরিৎ ও মৌসুমী পর্ণমোচী বৃক্ষ অধিক দেখা যায়। **শাল, শিশু, চাম, সুন্দরী, গামারী, শিমুল, জারুল** প্রভৃতি বৃক্ষ এবং **বাঁশ** ও **বেত** প্রচুর জন্মে। অঞ্চলটি বনজ সম্পদে সমৃদ্ধ। ভারতের অন্য কোন রাজ্যে এই অঞ্চলের মত গভীর জঙ্গল নাই। এই জঙ্গলের মধ্যে ১৬,৫১০ বর্গ কিলোমিটার স্থান সরকারী তত্ত্বাবধানে রক্ষিত। বনভূমি আয়তনে রাজ্যের প্রায় কুড়ি শতাংশ জমি অধিকার করিয়া রহিয়াছে। বনভূমি হইতে কাঠ, বাঁশ, বেত, নানারকম গাছ-গাছড়া, ওষধি ও লাক্ষা সংগৃহীত হয়। এইসব বস্তু বাজারে ন্যায্য মূল্যে বিক্রীত হয়। এই অঞ্চলের জলবায়ু **রবার চাষের** অনুকূল থাকায় উপত্যকার অধিক ঢাল অঞ্চলে রবার গাছের চাষ পরীক্ষামূলক ভাবে শুরু করা হইয়াছে। বনভূমি অঞ্চলে তুঁত গাছ জন্মে। তুঁতের পাতা গুটিপোকার খাদ্য। গুটিপোকা হইতে **রেশম, মুগা** ও **এণ্ডির গুঁটি** সংগ্রহ করা হয়।

জীবজন্তু : এই অঞ্চলের জঙ্গলে হাতী, গণ্ডার, মহিষ, ব্যাঘ্র, হরিণ ও অন্যান্য বন্য জন্তু এবং ধনেশ, টিয়া, ময়না, ময়ূর ও বন্য মোরগ প্রভৃতি পক্ষী আছে। নানা প্রকার বিষধর সর্পের সংখ্যাও এই অঞ্চলের জঙ্গলে কম নহে। বনভূমি হইতে হাতীর দাঁত, মৃগনাভি, হরিণের চামড়া, শিং ও ব্যাঘ্রচর্ম প্রভৃতি সামগ্রী সংগৃহীত হয়। শিবসাগর জিলায় **কাজিরাঙ্গা সংরক্ষিত বনভূমি** একশৃঙ্গ গণ্ডারের জন্য পৃথিবী-বিখ্যাত। ইহা ছাড়া আরও নানা রকমের পশুপক্ষী এই সংরক্ষিত বনে স্বাভাবিক প্রকৃতিতে মুক্ত অবস্থায় দেখা যায়। ইহা দেখিবার জন্য প্রতি বৎসর দেশবিদেশ হইতে অনেক ভ্রমণকারী এখানে আসেন।

খনিজ সম্পদ : ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার উত্তর-পূর্ব অংশে ডিব্রুগড় জিলার ডিগবয়, নাহারকাটিয়া, হুগরিজান, মোরান ও শিবসাগর জেলার রুদ্রসাগর, লাকোয়া ও গেলেকি অঞ্চলে খনি হইতে **খনিজ তৈল** উত্তোলিত হয়। ডিগবয়ে ও গৌহাটির

নিকটে নূনমাটিতে খনিজ তৈলের শোধনাগার আছে। স্থানে স্থানে পাহাড়ী এলাকায় **চূণাপাথর, সিলিমেনাইট, কেওলীন ও কোরাণ্ডাম** প্রভৃতি খনিজ সামগ্রীর খনি পাওয়া গিয়াছে। মার্গেরিটা ও লিডুর নিকটে কয়েকটি **কয়লাখনি** আছে। এই কয়লা লিগনাইট জাতীয়। এখানে উৎকৃষ্ট **ফায়ার** ক্লে পাওয়া যায়। এই অঞ্চলেই ভারতের মধ্যে সর্বাধিক খনিজ তৈল উত্তোলিত হয়।

অর্থ নৈতিক ও সামাজিক পরিবেশ ঃ

অধিবাসী ঃ এই অঞ্চলে প্রতি বর্গ মাইলে ১৫০ জন লোক বাস করে। অপর দিকে গাঙ্গেয় সমভূমিতে প্রতি বর্গ মাইলে ৫০০ জন লোক বাস করে। এই অঞ্চলের অধিবাসীদের অধিকাংশই অসমীয়া এবং উহার পরই বাঙালী অধিবাসীদের স্থান। নানা প্রকার খণ্ডজাতি, আদিবাসী ও নেপালী লোকের সংখ্যাও কম নহে। আঞ্চলিক ভাষা অসমীয়া। বাঙালী অধিবাসীদের মধ্যে বাংলাভাষা প্রচলিত। পার্বত্য অঞ্চলের অধিবাসী বিভিন্ন উপজাতি নিজেদের মধ্যে প্রচলিত ভিন্ন ভিন্ন উপভাষায় কথা বলিয়া থাকে। অধিবাসীদের মধ্যে কৃষিজীবীর সংখ্যাই অধিক। চা-বাগানের শ্রমিক হিসাবে এই অঞ্চলে অনেক বিহারী, ওড়িয়া ও মাদ্রাজী বাস করে।

কৃষি ও জলসেচ ঃ এই অঞ্চলের এক-চতুর্থাংশের কম জমিতে চাষ-আবাদ করা হয়। প্রায় অর্ধেক ভূভাগই প্রাকৃতিক অবস্থায় আবাদের অনুপযুক্ত। ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় বিশেষ জলসেচ ব্যবস্থার প্রয়োজন এখনও হয় নাই। নওগাঁ জিলায় **যমুনা জলসেচ প্রকল্পই** একমাত্র জলসেচ ব্যবস্থা। উহা দ্বারা খরার সময় কৃষিক্ষেত্রে জলসেচ করা হয়। প্রতি বৎসর বর্ষায় ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার অনেক অংশ বন্যাপ্লাবিত হয়। বর্তমানে বন্যারোধ ও জল নিকাশের ব্যবস্থা উন্নততর করিবার প্রয়াস চলিতেছে। এই উপত্যকার পলল মৃত্তিকায় পলি ও কাদার অংশ বেশী থাকায় জমি ক্ষেত-খামারের উপযোগী। আবাদী জমির ⅔ অংশে ধান ও পাট চাষ করা হয়; ইক্ষু ও তৈলবীজ অন্যতম উৎপন্ন দ্রব্য। ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় অনেক **চা-বাগান** বিদ্যমান। অনুচ্চ পর্বতগাত্রে ও ঢালু সমতল ভূমিতে চায়ের চাষ হয়। আসাম চায়ের জন্য পৃথিবী-খ্যাত। এখানকার **চা** প্রতিবেশী রাজ্যে ও পৃথিবীর বিভিন্ন রাষ্ট্রে রপ্তানি হয়। রাজ্যের অধিবাসীদের ১২ শতাংশ লোক **চা-শিল্পের** সহিত যুক্ত। ভারতের মোট উৎপন্নের ৫২ শতাংশ চা ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় জন্মে। উৎপাদিত চা **গৌহাটিতে** ও **কলিকাতায়** নীলামে বিক্রয়ের জন্য প্রেরিত হয়। ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় নানা রকমের সুস্বাদু ফলের চাষ হয়। ইহার মধ্যে কমলালেবু, আনারস, কলা ও নারিকেল প্রধান।

বিদ্যুৎ ও শ্রমশিল্প ঃ এই উপত্যকায় ব্রহ্মপুত্রনদের দক্ষিণতীরে **নারাঙ্গী** ও **চন্দ্রপুর** নামক দুই জায়গায় তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রে যথাক্রমে ১২.৫ হাজার ও ৩০ হাজার

কিলোওয়াট তাপবিদ্যুৎ উৎপাদিত হইতেছে। ইহা হইতে গৌহাটী শহর ও শহরতলীতে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হয়। **নামরূপ** তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রটি উপত্যকার শিবসাগর জিলায় স্থাপিত হইয়াছে। কেন্দ্রটিতে নাহারকাটিয়া তৈলাঞ্চলের প্রাকৃতিক গ্যাস হইতে বিদ্যুৎ উৎপাদিত হয়। এখানে প্রথম পর্যায়ে ২৩ হাজার কিলোওয়াট তাপবিদ্যুৎ উৎপাদিত হয়। দ্বিতীয় ও তৃতীয় পর্যায়ের প্রত্যেকটিতে ৩০ হাজার কিলোওয়াট তাপবিদ্যুৎ উৎপাদিত হইবার কথা। এই দুইটির মধ্যে দ্বিতীয়টি চালু হইয়াছে। তৃতীয়টি পঞ্চম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় সম্পন্ন হইবে। এই কেন্দ্রের বিদ্যুৎ ডিব্রুগড়, তিনসুকিয়া, জোড়হাট, নাজিরা, ডুমডুমা ও গোলাঘাট শহরগুলিতে এবং নাগাল্যাণ্ড রাজ্যে পাঠান হইবে।

শ্রমশিল্পের মধ্যে এই উপত্যকা **চা শিল্পে** বিশেষ উন্নত। এখান হইতে প্রচুর পরিমাণে চা রপ্তানি হইয়া থাকে। এই উপত্যকার **ডিগবয়ে** ও গৌহাটীর নিকট **নুনমাটিতে** খনিজ তৈল শোধনাগার স্থাপিত রহিয়াছে। তৃতীয় শোধনাগারটি গোয়ালপাড়া জিলার **বঙ্গাইগাওঁয়ে** স্থাপিত হইবে। ইহার নির্মাণকার্য চলিতেছে। ইহার নিকটে **পেট্রো-কেমিক্যাল** কারখানাটিও নির্মাণের পথে। **নামরূপে** সরকারী সংস্থায় রাসায়নিক সার প্রস্তুত হয়। উপত্যকায় ধানকল, পাটকল ও প্লাইউড কারখানা কার্যকরী রহিয়াছে। শিবসাগর জিলায় **বড়ুয়াবামুনগাওঁ** নামক স্থানে এই অঞ্চলের একমাত্র চিনির কারখানা বিদ্যমান। মিকির পাহাড় জিলায় **বোকাজান** নামক স্থানে একটি সিমেণ্ট কারখানা নির্মিত হইতেছে। গোয়ালপাড়া জিলায় **অশোক পেপার মিলস্** ও **আসাম এ্যালক্যালি এণ্ড এ্যালায়েড কেমিক্যালস্** এই দুইটি কারখানা নির্মাণের পথে। কুটীরশিল্পের উন্নয়নকল্পে গৌহাটীতে ভারত সরকারের তত্ত্বধানে **'ক্ষুদ্রশিল্প সার্ভিস'** সংস্থা স্থাপিত হইয়াছে। বাঁশ ও বেতের সামগ্রী, পিতল ও কাঁসার তৈজসপত্র ও কাষ্ঠসামগ্রী কুটীরশিল্প হিসাবে প্রস্তুত হয়। এখানকার তাঁতে বোনা সূতীবস্ত্র, রেশম বস্ত্র ও এণ্ডি-মুগার কাপড় বিশেষ প্রসিদ্ধ।

পরিবহণ ও বাণিজ্য : উপত্যকায় রাজপথের মোট দৈর্ঘ্য প্রায় ২০ হাজার কিলোমিটার ; ইহার মধ্যে প্রায় ৪ হাজার কিলোমিটার সড়ক পাকা। উপত্যকায় মোটরগাড়ী, মোটরবাস, লরী যাতায়াত করে। উপত্যকায় নদীপথে সামগ্রী ও আরোহী স্থানান্তরিত হয়। ব্রহ্মপুত্র নদই এই অঞ্চলের প্রধান জলপথ। নাব্য নদীপথে প্রায় ৯ হাজার কিলোমিটার দীর্ঘ পথে যাতায়াত করা যায়। ইহাদের মধ্যে ষ্টীমার পথের দৈর্ঘ্য ১·৫ হাজার কিলোমিটার।

বিমান পরিবহণ ব্যবস্থায় উপত্যকার স্থান বেশ গুরুত্বপূর্ণ। গৌহাটীর **বোড়ঝার,**

ডিব্রুগড়ের **মোহনবাড়ী**, তেজপুরের **সালোনি** ও জোড়হাটের **রৌড়িয়া** বিশিষ্ট বিমানঘাঁটি। এই সকল বিমানঘাঁটিতে ইণ্ডিয়ান এয়ারলাইনসের বিমানপোত নিত্য যাতায়াত করে।

এই উপত্যকায় ২০৮৩ কিলোমিটার রেলপথ আছে। এই রেলপথের নাম **উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলপথ**। নিউ বঙ্গাইগাওঁ, গৌহাটী, চাপারমুখ, লামডিং, ফারকাটিং, মরিয়ানী, তিনসুকিয়া ও ডিব্রুগড় প্রভৃতি প্রধান রেলষ্টেশন।

কামাখ্যা দেবীর মন্দির

উপত্যকা হইতে নানাবিধ ফল, চা, কুটীরশিল্পজাত সামগ্রী, পিতল ও কাঁসার সামগ্রী, কাঠের সামগ্রী, বাঁশ ও বেতের সামগ্রী, রেশমবস্ত্র ও সূতীবস্ত্র এবং খনিজ তৈল **রপ্তানি** হয়। লবণ, খাদ্যসামগ্রী, গম, ডাল, কার্পাসবস্ত্র, বিলাসদ্রব্য, ঔষধ, কাগজ, রসায়নসামগ্রী, কয়লা, লৌহ-ইস্পাতনির্মিত সামগ্রী, যন্ত্রপাতি ও যানবাহন ইত্যাদি উপত্যকাতে **আমদানি** করা হয়।

প্রধান নগর ঃ **গৌহাটী**—ব্রহ্মপুত্র নদের তীরে অবস্থিত উপত্যকার প্রধান নগর ও বাণিজ্যকেন্দ্র। এখানে বিশ্ববিদ্যালয় ও হাইকোর্ট আছে। ইহার নিকটে **দিসপুরে** আসাম রাজ্যের অস্থায়ী রাজধানী স্থাপিত হইয়াছে। ইহার অদূরে নীলাচল পাহাড়ের উপর **কামাখ্যা দেবীর মন্দির** এবং ব্রহ্মপুত্র নদের মধ্যস্থলে ভস্মাচল নামক পাহাড়ের উপর **উমানন্দ শিবের মন্দির** হিন্দুদের প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান।

সদিয়া—উত্তর পূর্ব সীমান্তের নিকট একটি নগর। এইানে সেনানিবাস আছে। **শিবসাগর** আহোম রাজাদের নির্মিত ইতিহাসপ্রসিদ্ধ নগর। এখানে তৈল ও প্রাকৃতিক গ্যাস কমিশনের আঞ্চলিক সদর দপ্তর আছে। **নওগাঁ**—ধান, পাট ও তৈলবীজ ব্যবসায়ের কেন্দ্র। **জোড়হাট**—চা ব্যবসায়ের কেন্দ্র। শিবসাগর জিলার সদর ষ্টেশন। এখানে একটি কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় আছে। **ডিব্রুগড়**—ডিব্রুগড় জিলার সদর শহর, ব্যবসাকেন্দ্র ও প্রধান স্থান। এখানে একটি বিশ্ববিদ্যালয়, একটি মেডিকেল কলেজ ও অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আছে। ইহা ব্রহ্মপুত্র নদের তীরে অবস্থিত। **চাপারমুখ, লামডিং, ফারকাটিং, মরিয়ানী** ও **তিনসুকিয়া** রেল জংশন। **তেজপুর**—দরং জিলার সদর ষ্টেশন। ইহা ব্রহ্মপুত্র নদের তীরে অবস্থিত। এখানে উন্মাদ ব্যক্তিদের চিকিৎসার জন্য চিকিৎসালয় আছে। শহরের নিকটে **অগ্নিগড়ে** ইতিহাসপ্রসিদ্ধ **বাণ রাজার** রাজধানী ছিল বলিয়া জনপ্রবাদ। **গোয়ালপাড়া** ও **ধুবড়ী** ব্রহ্মপুত্র নদের তীরে দুইটি প্রধান নগর। ধুবড়ীতে একটি দিয়াশলাই কারখানা আছে।

অনুশীলনী

১। ব্রহ্মপুত্র নদ কোথায় ভারতে প্রবেশ করিয়াছে? ভারতে প্রবেশ করিয়া এই নদী পশ্চিম দিকে প্রবাহিত হইয়াছে কেন? এই নদীতে বহুসংখ্যক পলিগঠিত চর দেখা যায় কেন?

২। ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার সর্বপ্রধান খনিজ সম্পদ কি? কোন্ কোন্ স্থানে উহা পাওয়া যায়? উপত্যকার মানচিত্র আঁকিয়া উহাদের অবস্থান দেখাও।

৩। আসাম রাজ্য শ্রমশিল্পে অনুন্নত কেন? কোন্ কোন্ শিল্পে এই রাজ্যের উন্নতি সম্ভব?

৪। আসাম রাজ্যে জলবিদ্যুৎ উৎপাদন অত্যাবশ্যক কেন? এই রাজ্যে কোন্ কোন্ স্থানে জলবিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়?

৫। ভৌগোলিক কারণ নির্দেশ কর :—

(ক) উর্ধ্ব আসামে প্রতি বৎসর বন্যা হয়।

(খ) আসাম রাজ্যে সর্বাপেক্ষা বেশী চা উৎপন্ন হয়।

(গ) ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার প্রধান খাদ্যশস্য ধান।

(ঘ) গৌহাটিতে বৃহৎ চায়ের বাজার আছে।

(ঙ) ধুবড়ীতে একটি দিয়াশলাই কারখানা আছে।

(চ) কাজিরাঙ্গায় এত বিদেশী পর্যটক আসে কেন? (মা. প. ১৯৭৬)
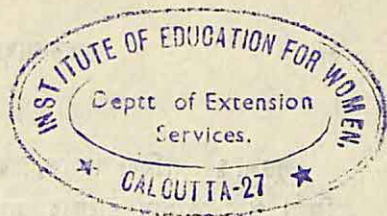
নবম পাঠ

উত্তর-পূর্ব ভারতের পার্বত্য রাজ্যসমূহ

(মেঘালয়, নাগাল্যাণ্ড, মণিপুর ও ত্রিপুরা রাজ্যসমূহ)

সূচনা ঃ ভারতের উত্তর-পূর্বের পার্বত্য রাজ্যসমূহ হইল **মেঘালয়, নাগাল্যাণ্ড, মণিপুর ও ত্রিপুরা।** উহাদের প্রত্যেকটিই পর্বতসঙ্কুল। এইজন্য উহাদের পার্বত্য রাজ্য বলা হয়। আসামের রাজ্যপালই উল্লিখিত পূর্বভারতের পার্বত্য রাজ্যসমূহের রাজ্যপাল।

অবস্থান ও ভূ-প্রকৃতি ঃ উত্তর-পূর্ব ভারতের পার্বত্য রাজ্যসমূহ পূর্ব-হিমালয় অঞ্চলের পূর্ব সীমায় উত্তর-পূর্ব সীমান্ত ও পূর্ব সীমান্ত পর্বতমালার মধ্যে অবস্থিত। এই পার্বত্য রাজ্যগুলি ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার প্রায় সমগ্র দক্ষিণ সীমানা ব্যাপিয়া রহিয়াছে। উহাদের প্রত্যেকটি ভারত যুক্তরাষ্ট্রের পূর্ব-সীমান্তের গুরুত্বপূর্ণ রাজ্য।

এই রাজ্যসমূহ ২২° উঃ—২৭° উঃ অক্ষাংশের এবং ৯০°—৯৭° পূঃ দ্রাঘিমাংশের মধ্যে অবস্থিত। উক্ত উত্তর-পূর্ব সীমান্ত ও পূর্ব সীমান্ত পর্বতগুলিকে পূর্ব-হিমালয়ের পূর্ব ও দক্ষিণ দিকের অভিক্ষেপ বলা চলে। পাহড়গুলির মধ্যে পাটকাই, নাগা ও লুসাই পাহাড় প্রধান। পূর্ব-হিমালয়ের অভিক্ষেপের এই পর্বতগুলিকে **আসাম পর্বতমালা** আখ্যাও দেওয়া হয়। মেঘালয় রাজ্যের জয়ন্তিয়া, খাসিয়া ও গারো পাহাড়ত্রয় দাক্ষিণাত্য মালভূমির সম্প্রসারণ মাত্র। এই পার্বত্য অঞ্চলে মালভূমি ও উপত্যকা বিদ্যমান। মালভূমি ও উপত্যকার উপর দিয়া ছোট ছোট নদী প্রবাহিত।

জলবায়ু ঃ এই অঞ্চলের জলবায়ু আর্দ্র। তাপমাত্রা মহাদেশীয়। বারিপাত উচ্চ মৌসুমী।

উদ্ভিদ ঃ স্থানীয় মহাদেশীয় আর্দ্র মৌসুমী জলবায়ু উদ্ভিদের উপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। **চিরহরিৎ** বৃক্ষ, বাঁশ, বেত, কলা, আনারস ও চা এই অঞ্চলের নিম্ন উচ্চতায় জন্মে। মধ্য উচ্চতায় **মৌসুমী পর্ণমোচী** বৃক্ষ জন্মে। অধিক উচ্চতায় **সরলবর্গীয়** বৃক্ষই প্রধান। ইহা ছাড়া নানা রকমের গুল্ম ও অর্কিড এই অঞ্চলে জন্মে।

জীবজন্তু ঃ এই অঞ্চলের জঙ্গলে ব্যাঘ্র, গণ্ডার, হস্তী, মহিষ ও হরিণ প্রভৃতি বন্যপশু, ধনেশ, টিয়া ও ময়না প্রভৃতি পক্ষী এবং নানারকম বিষধর সর্প দেখা যায়।

মেঘালয়

সূচনা ঃ খাসিয়া পাহাড়, জয়ন্তিয়া পাহাড় ও গারোপাহাড়—এই তিনটি পার্বত্য জিলা পূর্বে আসাম রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। কিন্তু অধিবাসীদের রাজনৈতিক আন্দোলনের ফলে প্রথমে আসাম রাজ্যের মধ্যে রাখিয়াই এই তিন জিলাকে একত্রে **'মেঘালয়'** নাম নাম দিয়া স্বায়ত্তশাসনের অধিকার দেওয়া হয়। পরে ১৯৭১খ্রীঃ ২৯শে জানুয়ারী তারিখে মেঘালয়কে রাজ্যপাল শাসিত রাজ্যে উন্নীত করা হয়। আসামের রাজ্যপালই এই রাজ্যের প্রধান শাসনকর্তা। আসাম হাইকোর্টই এই রাজ্যের প্রধান বিচারালয়ের কাজ করেন।
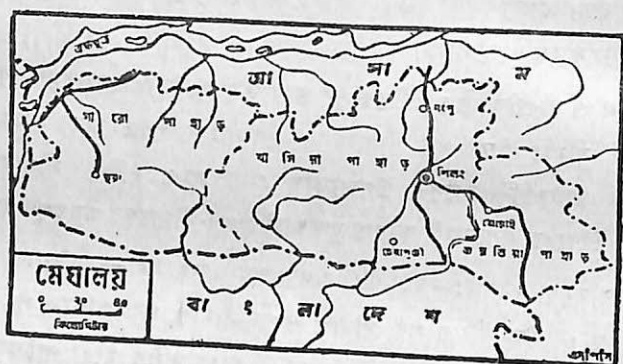
অবস্থান ও ভু-প্রকৃতি ঃ এই রাজ্যের উত্তরে আসাম রাজ্যের কামরূপ ও গোয়ালপাড়া জিলাদ্বয় অবস্থিত। দক্ষিণে ও পশ্চিমে বৈদেশিক রাষ্ট্র বাংলাদেশ। পূর্বদিকে আসাম রাজ্যের উত্তর কাছাড় ও মিকির পাহাড় জিলা এবং কাছাড় জিলা। এই পার্বত্য রাজ্যটি আয়তনে প্রায় ২২,৪৮৯ বর্গ কিলোমিটার। এই পার্বত্য অঞ্চলে বারিপাত অত্যধিক এবং বৎসরের অনেক সময় এই অঞ্চলের আকাশে মেঘ জমা থাকে বলিয়াই ইহাকে **মেঘালয়** বলা হয়। এই রাজ্যটি পাহাড় ও উচ্চ মালভূমি লইয়া গঠিত। এখানে সমভূমির পরিমাণ অতি অল্প, উল্লেখযোগ্য কোন নদী নাই, মাঝে মাঝে জলপ্রপাত ও সংকীর্ণ স্রোতস্বতী বিদ্যমান।

অধিবাসী ঃ এই রাজ্যের অধিবাসীদের সংখ্যা প্রায় ১০·২ লক্ষ। অধিবাসীদের অধিকাংশই খাসিয়া, জয়ন্তিয়া ও গারো প্রভৃতি পাহাড়িয়া জাতি। কিছু সংখ্যক অসমীয়া, বাঙ্গালী ও নেপালী এই রাজ্যে বাস করে। এই রাজ্যের পার্বত্য জাতিদের ভাষা খাসিয়া, জয়ন্তিয়া ও গারো। ইহাদের মধ্যে ইংরাজী শিক্ষার প্রচলন অধিক। ইহা ভিন্ন অসমীয়া, বাঙ্গালী ও নেপালীদের প্রত্যেকে নিজ নিজ ভাষায় কথা বলে।

জলবায়ু ঃ এই রাজ্যের জলবায়ু আর্দ্র ও শীতপ্রধান। ইহা মৌসুমী অঞ্চলের

অন্তর্ভুক্ত। এখানে বারিপাত প্রচুর হয়। **চেরাপুঞ্জীর** নিকটবর্তী **মৌসিনরাম** নামক স্থানে পৃথিবীর মধ্যে সর্বাধিক বৃষ্টিপাত হয়। বৎসরে বারিপাত প্রায় ১২৭০ সেন্টিমিটারের অধিক। কিন্তু শিলং শহরে বৃষ্টিপাত বৎসরে গড়ে ১০৩·২ সেন্টিমিটারের অধিক নহে। ইহার কারণ, এই শহরটি **বৃষ্টিচ্ছায়** অঞ্চলে অবস্থিত।

উদ্ভিদ ঃ এই রাজ্যের বনভূমিতে শাল, শিশু, শিমুল, জারুল ও সরলবর্গীয় বৃক্ষ জন্মে। অপেক্ষাকৃত নিম্ন উচ্চতায় সিঙ্কোনার চাষ হয়। সিঙ্কোনা হইতে ম্যালেরিয়া জ্বরের ঔষধ কুইনাইন তৈরী হয়।

জীবজন্তু ঃ এই রাজ্যে হিংস্র বন্যজন্তুর সংখ্যা অল্প। কোন কোন জায়গায় হাতী, বাঘ, শূকর ও মহিষ দেখা যায়।

জলসেচ ও বিদ্যুৎ ঃ রাজ্যসরকার পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মাধ্যমে জলসেচ প্রথা কার্যকরী করেন। সমগ্র কৃষি ভূমির ২৭ শতাংশে জলসেচ হয়। অনেক স্থানে বিদ্যুৎ-চালিত পাম্পে জল তোলা হয়। প্রায় ১০০টি বিদ্যুৎ-চালিত পাম্প জলসেচ কার্যে নিযুক্ত রহিয়াছে। বর্তমানে স্থান বিশেষে বিদ্যুৎ দ্বারা চালিত পাম্পের সাহায্যে কৃষিক্ষেত্রে জলসেচের ব্যবস্থা করা হয়।

এই রাজ্যে **উমত্রু** ও **বড়পানি** নামক স্থানে জলবিদ্যুৎ উৎপাদিত হয়। গারো পাহাড়ে **নাঙ্গালবিব্রাতে** একটি তাপবিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছে। রাজ্যের শহরাঞ্চল ছাড়াও অনেক গ্রামে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হয়। এই রাজ্যের প্রয়োজন মিটাইয়া অতিরিক্ত বিদ্যুৎ প্রতিবেশী আসাম ও ত্রিপুরা রাজ্যদ্বয়ে সরবরাহ করা হয়। বাৎসরিক বিদ্যুৎ-উৎপাদন মাত্রা প্রায় ৫৬ মেগাওয়াট।

কৃষি ঃ মেঘালয় রাজ্যে প্রায় ৮০ শতাংশ লোক কৃষিজীবী। আবাদী জমির ২৭ শতাংশে জলসেচ হয়। বিশেষ বিশেষ ক্ষেত-খামারে উচ্চস্তরের ধান, গম ও ভুট্টা জন্মে। রাজ্যে আলু, তেজপাতা, ইক্ষু, তৈলবীজ, তুলা, পাট, মেস্তা (Mesta), তামাক, আদা, সুপারী, কমলালেবু, আনারস, কলা, পেঁপে, পিচ ও নাসপাতি প্রভৃতি ফসল, ফল ও নানারকমের শাক-সব্জী প্রচুর উৎপন্ন হয়। খাসিয়া-জয়ন্তিয়া পাহাড়ে রেশমকীটের চাষও হয়। সরকারী উদ্যোগে কফির চাষও হইতেছে।

দানাশস্যের বার্ষিক উৎপাদন প্রায় **১·৩৭** লক্ষ টন। বছরে ৫০ হাজার বেল পাট, **৭১** হাজার টন আলু এবং ৫ হাজার টন টাপিওকা উৎপন্ন হয়। মেসতা উৎপাদন বছরে **২·৩** হাজার বেল। ইহা ছাড়া প্রতি বৎসর ২৩০ টন তামাক পাতা, ৩·৯ টন সুপারি এবং ২১০ টন ইক্ষু উৎপন্ন হয়।

মেঘালয় রাজ্যে ফলের বাগিচা অর্থপ্রসূ হইয়াছে। রাজ্যে প্রতি বৎসর ৭০ হাজার আনারস, ৮০ হাজার কমলালেবু এবং **৩৫** হাজার কলা উৎপন্ন হয়।

খনিজ সম্পদ ও শ্রমশিল্প ঃ এই রাজ্যের খাসিয়া, জয়ন্তিয়া ও গারো পাহাড়ে **লিগনাইট** (বাদামী রঙের কয়লা), **কেওলিন** (চীনামাটি), **সিলিমেনাইট, চূনাপাথর** ও **কোরাণ্ডাম** খনিতে পাওয়া যায়। গারো পাহাড়ে রঙীন বেলেপাথর প্রচুর পাওয়া যায়। ভারতের সিলিমেনাইটের মোট উৎপাদনের ১৫ শতাংশ এই মেঘালয় রাজ্যের খনি হইতে উত্তোলিত হয়। রাজ্যে কয়লার নিরূপিত সঞ্চয় পরিমাণ **১২০** কোটি টন ; চূণাপাথর **২১০** কোটি টন এবং চীনা মাটি **১** কোটি টন।

এই রাজ্যে চেরাপুঞ্জী নামক স্থানে একটি সিমেণ্ট কারখানা চালু আছে। কারখানাটি বর্তমানে প্রতিদিন ২৫০ টন সিমেণ্ট প্রস্তুত করে। কারখানাটির উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি করা হইবে। রাজ্যে-শিল্পোন্নয়ন করপোরেশন শ্রমশিল্প স্থাপনে উদ্যোগী। সংস্থাটি বৃহৎ ও মাঝারি শিল্প কারখানা স্থাপনের চেষ্টা করিতেছে। কুটীরশিল্পের উন্নয়নেও সংস্থাটি খুবই সচেষ্ট। এই রাজ্যে কুটিরশিল্পে তাঁতের কাপড়, বাঁশ ও বেতের আসবাবপত্র, কাঠের জিনিস, পশমবস্ত্র ও কম্বল প্রস্তুত হয়। গারোপাহাড়ে **দারুগিরিতে** কাষ্ঠ সংরক্ষণ কারখানা স্থাপিত হইয়াছে।

পরিবহণ ও বাণিজ্য ঃ এই রাজ্যটি পর্বতসঙ্কুল ও ঘন জঙ্গলে আবৃত। কাজেই সমগ্র রাজ্যে রাজপথ ও রেলপথ নির্মাণ করা খুবই কঠিন। এই রাজ্যে পরিবহণ ব্যবস্থা এখনও অনুন্নত। এই রাজ্যে কোন রেলপথ নাই। অধিবাসীরা পাহাড়ী পথে রাজ্যের একস্থান হইতে অন্যস্থানে যাতায়াত করে। আসাম রাজ্যের **গৌহাটী** হইতে একটি রাজপথ **শিলং** হইয়া **চেরাপুঞ্জি** পর্যন্ত গিয়াছে। আবার **শিলং** হইতে অপর একটি রাজপথ **জোয়াই** হইয়া আসাম রাজ্যের কাছাড় জিলার **বদরপুর** এবং **ত্রিপুরা** রাজ্যের ধর্মনগরের সহিত সংযোগ স্থাপন করিতেছে। অপর একটি রাজপথ আসামের **গোয়ালপাড়া** হইতে মেঘালয় রাজ্যের গারো পাহাড়ের প্রধান শহর **তুরা** পর্যন্ত গিয়াছে। অপর একটি রাস্তা এই রাজ্যের রাজধানী **শিলং** হইতে সীমান্ত শহর **ডাউকী** পর্যন্ত গিয়াছে।

এই রাজ্য হইতে কুটীরশিল্পজাত সামগ্রী, খনিজ সামগ্রী, সিমেণ্ট, গোলআলু, আদা, কমলালেবু, কমলামধু, তেজপাতা ও শাক-সব্জী ভারতের অন্যান্য রাজ্যে **রপ্তানি** করা হয়। লবণ, কেরোসিন তৈল, চিনি, পোষাক-পরিচ্ছদ, কাগজ, যন্ত্রপাতি, ঔষধ ও প্রসাধন সামগ্রী ভারত রাষ্ট্রের অন্যান্য রাজ্য ও বিদেশ হইতে এই রাজ্যে **আমদানি** করা হয়।

প্রসিদ্ধ স্থান ঃ শিলং—পূর্বে আসাম রাজ্যের রাজধানী ছিল। বর্তমানে ইহা মেঘালয় রাজ্যের রাজধানী। ভারতের সুরম্য পার্বত্য স্বাস্থ্যনিবাসগুলির মধ্যে ইহা অন্যতম। ইহার নিকটে **বিশপ ও বিডন** জলপ্রপাত প্রসিদ্ধ। এই দুই

জলপ্রপাত দেখার জন্য বহু পর্যটকের সমাগম হয়। এখানে বর্তমানে একটি কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। **চেরাপুঞ্জি**—কমলালেবু, তেজপাতা, সিমেন্ট কারখানা ও চূণাপাথরের জন্য বিখ্যাত। এখানে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়। **মৌসিনরাম**—চেরাপুঞ্জির অনতিদূরে অবস্থিত। এখানে পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা অধিক বৃষ্টিপাত হয়। বারিপাত বৎসরে গড়ে প্রায় ১২৭০ সে. মি.। **তুরা**—গারো পাহাড়ের প্রধান শহর। **জোয়াই**—জয়ন্তিয়া পাহাড়ের প্রধান বাণিজ্য স্থান। এই স্থানের মধ্য দিয়া নির্মিত রাজপথ শিলং-এর সহিত আসাম রাজ্যের কাছাড় জিলার সংযোগ স্থাপন করিতেছে। **নংপো** (Nangpoh)—গৌহাটি-শিলং সড়কের উপর অবস্থিত। এখানে সিঙ্কোনা গাছের চাষ হয়। **ডাউকী**—সীমান্তবর্তী বাণিজ্যস্থান। উহা বাংলাদেশ-মেঘালয় সীমায় অবস্থিত। **বড়পানি ও উমত্রু** জলবিদ্যুৎ এবং **নাঙ্গালবিব্রা** তাপবিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র।

নাগাল্যাণ্ড

সূচনা ঃ নাগাল্যাণ্ড পূর্বে 'নাগাপাহাড় জিলা' নামে আসাম রাজ্যের একটি জিলা ছিল। ১৯৫৭ খ্রীঃ ১লা ডিসেম্বর হইতে এই জিলা ও নেফা (বর্তমানে অরুণাচল প্রদেশ) অঞ্চলের তুয়েনসাং জিলা একত্রিত করিয়া কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে আনা হয়। ১৯৬২ খ্রীঃ ১৯শে আগষ্ট এই অঞ্চলকে **নাগাল্যাণ্ড** নামে ভারত যুক্তরাষ্ট্রের রাজ্যপাল শাসিত রাজ্যরূপে গণ্য করা হয়। আসামের রাজ্যপালই এই রাজ্যের রাজ্যপাল। আসাম হাইকোর্টই এই রাজ্যের হাইকোর্টের কাজ করেন।

অবস্থান ও ভূ-প্রকৃতি ঃ এই রাজ্যটি খুব ছোট। ইহাতে মাত্র তিনটি জিলা—কোহিমা, মোককচাং ও তুয়েনসাং। আয়তনে এই রাজ্যটি প্রায় ১৬,৫২৭ বর্গ কিলোমিটার। এই রাজ্যের উত্তরে আসাম রাজ্য, দক্ষিণে আসাম রাজ্য ও মণিপুর রাজ্য, পূর্বে ব্রহ্মদেশ এবং পশ্চিমে আসাম রাজ্য অবস্থিত। প্রায় সমগ্র নাগাল্যাণ্ড পর্বতময়। সরু দীর্ঘ পর্বতশ্রেণী ঘন বনে আবৃত। এই রাজ্যে কয়েকটি ছোট নদী আছে, কিন্তু কোন হ্রদ বা সরোবর নাই।

জলবায়ু ঃ সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে উচ্চে অবস্থিত এই পার্বত্য রাজ্যটি শীতপ্রধান। এখানে গ্রীষ্মে তাপমাত্রা কম, বৃষ্টিপাত প্রচুর হয়।

জীবজন্তু ঃ এই রাজ্যের জঙ্গলে বন্য-মহিষ, হাতী, হরিণ, বাঘ, চিতাবাঘ ও শূকর প্রভৃতি জন্তু দেখা যায়।

অধিবাসী ঃ রাজ্যে অধিবাসীর সংখ্যা প্রায় ৫.২ লক্ষ। অধিবাসীরা সাধারণতঃ নাগা নামে পরিচিত। এইজন্য এই রাজ্যের নাম **'নাগাল্যাণ্ড'** বা **'নাগাভূমি'**

হইয়াছে। নাগাদের মধ্যে আও, কোনিয়াক, লেমা, আংসি, আঙামী ও লোথা প্রভৃতি প্রায় ১৯টি প্রধান শাখা আছে। প্রত্যেক শাখার ভাষা পৃথক এবং সামাজিক
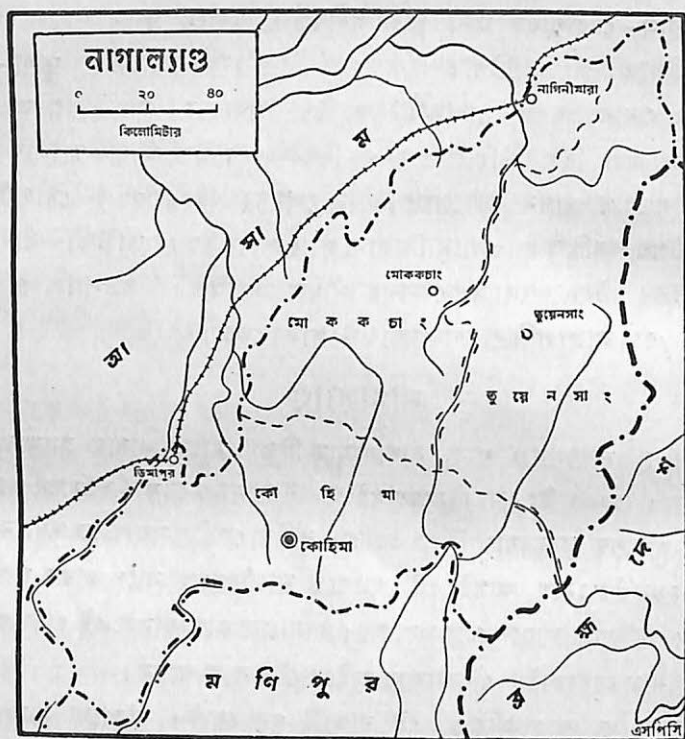
রীতিনীতিও পৃথক। বর্তমানে নাগাদের প্রায় ৭৩,৫০০ জন খৃষ্টধর্মাবলম্বী। পূর্বে অধিকাংশ নাগারা প্রাচীন প্রথা অনুযায়ী প্রকৃতির উপাসক ছিলেন। শিক্ষিত নাগারা ইংরেজী ভাষায় কথা বলেন। অন্যান্য নাগারা নিজ নিজ শাখার উপভাষা ব্যবহার করেন। আসাম রাজ্যের নিকটবর্তী অঞ্চলে বসবাসকারী নাগারা অসমীয়া ভাষায়ও কথাবার্তা বলিতে পারেন। এই রাজ্যে খৃষ্টান নাগাদের জন্য ৬৩২টি গীর্জা আছে। নাগারা বলিষ্ঠ, সাহসী, কর্মঠ ও যুদ্ধপ্রিয়। তীর ধনুক, বর্শা, কুঠার ও বন্দুকই উহাদের যুদ্ধাস্ত্র।

নাগাদের প্রধান গৃহপালিত জন্তুর নাম **'মেথোন'**। অধিকাংশ নাগারা পাহাড়ের উপরে বাসস্থান নির্মাণ করে। সমতলে অল্প সংখ্যক গ্রাম দেখা যায়। দূর হইতে পাহাড়ের উপরে নাগা বাসগৃহগুলিকে পার্বত্য দুর্গের মত দেখায়।

সাধারণতঃ নাগাদের গ্রামগুলি বড় বড়। গ্রামের ঘরগুলিও বড় বড়। এইগুলি কাঠ ও বাঁশ দ্বারা নির্মিত। ঘরগুলির উপরে টিনের ছাদ। প্রতি নাগা গ্রামে একটি **মরাঙ্গ** অবশ্যই থাকিতে হইবে। সমবায় পদ্ধতিতে নির্মিত গৃহকেই 'মরাঙ্গ' বলে। গ্রামের অবিবাহিত যুবকগণ এই গৃহে রাত্রিতে থাকে।

নাগাদের প্রধান খাদ্য ভাত, তবে উহারা মাছ ও মাংস খাইতে অধিক ভালবাসে। এইজন্য উহারা জঙ্গলে পশু শিকার করে ও নদীতে মাছ ধরে। উহারা নিজেদের প্রস্তুত করা একপ্রকার মদ্য পান করে। এই পানীয়ের নাম **'জু'**। উহা তাহাদের কার্যে শক্তি জোগায়। নাগারা নৃত্য ও সঙ্গীতপ্রিয়। উৎসবের সময় নাগা পুরুষ ও মহিলারা নানা রঙের পোষাক পরিধান করিয়া ও মাথায় পাখীর পালক বাঁধিয়া নৃত্য করে।

জলসেচ ও জলবিদ্যুৎ : পাহাড়ী নদীর জল ধানখেতে খালযোগে বাহিত করিয়া রাজ্যের স্থানে স্থানে জলসেচ প্রথা চালু হইয়াছে। সেচিত জমির ৮০ শতাংশে ধান উৎপন্ন হয়। এই রাজ্যে ২·১ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদিত হয়। বর্তমানে ১৪৫টি গ্রাম ও শহরে বিদ্যুৎ পরিবেশিত হয়। নাগাল্যাণ্ডে মোট গ্রামের সংখ্যা প্রায় ৮১৪টি।

কৃষি : রাজ্যের ৯০ শতাংশ অধিবাসী কৃষিজীবী। রাজ্যে প্রচুর ধান উৎপন্ন হয়। ধান চাষে ৬৩ হাজার হেক্টার জমি নিয়োজিত এবং বার্ষিক উৎপাদন প্রায় ৯০ হাজার টন। **জুম** প্রথায় কৃষিকার্য করা নাগাদের মধ্যে চালু। বর্তমানে চাষের নূতন পদ্ধতিও অনুসরণ করা হইতেছে। স্থানীয় সমবায় উন্নয়ন অফিস হইতে উৎকৃষ্ট বীজ, সার এবং চাষের নূতন যন্ত্রাদি কৃষকদের সরবরাহ করা হয়।

খনিজ সম্পদ ও শ্রমশিল্প : নাগাল্যাণ্ড রাজ্যে খনিজ সামগ্রীর অনুসন্ধান কার্য চলিতেছে। তাঁতশিল্প, রেশমশিল্প, কাঠ, বাঁশ ও বেতের সামগ্রী এই রাজ্যের কুটির-শিল্পের অন্তর্গত। রাজ্যে ছয়টি বয়ন-শিল্প কারখানা, তিনটি কুটিরশিল্প কারখানা, পাঁচটি রেশমশিল্পের কেন্দ্র এবং একটি কারিগরি বিদ্যা শিক্ষার কেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছে।

সরকারী উদ্যোগে রাজ্য উন্নয়ন পরিকল্পনায় কারিগরি বিদ্যাশিক্ষার ব্যবস্থা হইয়াছে এবং সম্ভাব্য শিল্প স্থাপনের চেষ্টা চলিতেছে।

পরিবহণ ও বাণিজ্য : পর্বতসঙ্কুল নাগাল্যাণ্ড রাজ্যে রেলপথ প্রস্তুতের কাজ খুব কঠিন। তবে এই রাজ্যের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে সামান্য অংশের উপর দিয়া উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলপথ চলিয়া গিয়াছে। এই রেলপথের **ডিমাপুর** ষ্টেশনটি এই রাজ্যের অন্তর্গত। এই রেলপথের **শিমলুগুড়ি** জংশন হইতে একটি শাখা **নাগিনীমারা** পর্যন্ত গিয়াছে। **নাগিনীমারাই** এই রাজ্যের দ্বিতীয় রেলষ্টেশন।

একটি পাকা রাজপথ এই রাজ্যের **ডিমাপুর** রেলষ্টেশন হইতে আরম্ভ করিয়া রাজ্যের রাজধানী **কোহিমা** হইয়া মণিপুর রাজ্যের রাজধানী **ইম্ফল** পর্যন্ত গিয়াছে। বর্তমানে আসাম রাজ্যের **মরিয়ানি** রেলওয়ে জংশন হইতে অপর একটি রেলপথ এই রাজ্যের অপর শহর **মোককচাং** পর্যন্ত নির্মাণের পরিকল্পনা আছে।

ডিমাপুরে একটি **বিমানঘাঁটি** স্থাপিত হইয়াছে। ফলে বিমানপথেও এই রাজ্যে যাত্রীরা যাতায়াত করে ও পণ্যসামগ্রী স্থানান্তরিত হয়।

রাজ্যটি পণ্য হিসাবে সামান্য কুটীরশিল্পজাত সামগ্রী, রেশম সূতা ও ফল **রপ্তানি** করে এবং লবণ, কেরোসিন তৈল, সিমেণ্ট, ঔষধ, ইস্পাত-সামগ্রী, যন্ত্রপাতি, যানবাহন, বিলাসদ্রব্য ও খাদ্যসামগ্রী **আমদানি** করে।

প্রসিদ্ধ স্থানঃ **কোহিমা**—নাগাল্যাণ্ড রাজ্যের রাজধানী। কোহিমাতে একটি কলেজ ও কয়েকটি স্কুল আছে। **ডিমাপুর**—নাগাল্যাণ্ড রাজ্যের একমাত্র বিমানঘাঁটি, প্রধান রেল ষ্টেশন ও বাণিজ্যস্থান। এখানে একটি কলেজ এবং কয়েকটি উচ্চ বিদ্যালয় আছে। এখানে প্রাচীন কাছাড়ী রাজাদের রাজধানীর ধ্বংসাবশেষ বিদ্যমান। **মোককচাং**—নাগাল্যাণ্ড রাজ্যের অপর শহর। **তুয়েনসাং**—তুয়েনসাং জিলার প্রধান শহর। **নাগিনীমারা**—এই রাজ্যের দ্বিতীয় রেল ষ্টেশন।

মণিপুর

সূচনা : মণিপুর ভারত যুক্তরাষ্ট্রের উত্তর-পূর্বে একটি পার্বত্য রাজ্য। মণিপুর রাজ্য পূর্ব সীমান্তে অবস্থিত বলিয়া ইহার সামরিক গুরুত্ব খুব বেশী।

প্রাক্ স্বাধীনতা সময়ে ইহা মহারাজ-শাসিত দেশীয় রাজ্য ছিল। পরে ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দে ইহা কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল হিসাবে ভারত যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হয়। ১৯৭২ খ্রীঃ ২১শে জানুয়ারী মণিপুর রাজ্যপাল শাসিত রাজ্যস্তরে উন্নীত হয়। বর্তমানে আসামের রাজ্যপালই রাজ্যের রাজ্যপালরূপে শাসনকার্য নির্বাহ করেন। আসাম হাইকোর্ট এই রাজ্যেরও প্রধান বিচারালয়ের কাজ করেন। শিক্ষাবিষয়ে মণিপুর গৌহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন।

অবস্থান ও ভূ-প্রকৃতিঃ এই রাজ্যের আয়তন প্রায় ২২,৩৫৬ বর্গ কিলোমিটার। ইহার উত্তরে নাগাল্যাণ্ড রাজ্য, দক্ষিণে ব্রহ্মদেশ ও মিজোরাম এলাকা, পূর্বে ব্রহ্মদেশ, পশ্চিমে আসাম রাজ্য। রাজ্যটি উচ্চভূমিতে অবস্থিত। এই উচ্চভূমিতে মাঝে মাঝে উপত্যকা আছে। এই রাজ্যটি পাহাড়, অরণ্য, হ্রদ ও জলাভূমিতে পরিপূর্ণ। মণিপুর উপত্যকার চারিদিকে স্তরে স্তরে খাড়াই পর্বতশ্রেণী দণ্ডায়মান।

খাড়াই পাহাড়ের গায়ে বিবিধ বৃক্ষের সারি ও নানাবিধ ফুল মণিপুর উপত্যকার প্রাকৃতিক দৃশ্যকে অতীব মনোরম করিয়া তুলিয়াছে।

এই রাজ্যে **মণিপুর নদী** প্রবাহিত। ইহা ব্রহ্মদেশের চিন্দুইন নদীর উপনদী। মণিপুর রাজ্যটি মণিপুর নদীর উপত্যকা। এই রাজ্যের সীমা দিয়া **বরাক** নদী প্রবাহিত। **লোগটক** মণিপুর রাজ্যের প্রধান হ্রদ। হ্রদটি আয়তনে বৃহৎ ও দেখিতে খুব সুন্দর।

জলবায়ু: রাজ্যটি সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে কিছুটা উচ্চতলে অবস্থিত বলিয়া শীতের প্রাধান্য বেশী। মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে মণিপুর রাজ্যে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়।

উদ্ভিদ: উচ্চ স্তরের বৃক্ষ রোপণ করিয়া মূল্যবান বনভূমি রাজ্যে স্থাপিত হইয়াছে। সমগ্র রাজ্যে প্রচুর বাঁশ উৎপন্ন হয়।

অধিবাসী: রাজ্যটিতে প্রায় ১১ লক্ষ লোকের বাস। অধিবাসীদের অধিকাংশই মণিপুরী। অন্যান্যদের মধ্যে নাগা, কুকী, লেপচা, নেপালী ও কিছু বাঙ্গালী আছে। রাজ্যের সংখ্যাগরিষ্ঠ অধিবাসীদের ভাষা মণিপুরী। হিন্দু মণিপুরীরা গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ভুক্ত। মণিপুরীরা নৃত্য-গীতে খুবই নিপুণ। হিন্দু মণিপুরীরা দোলযাত্রা,

ঝুলনযাত্রা ও রাসযাত্রা মহাসমারোহের সহিত পালন করিয়া থাকেন। মুসলমান মণিপুরীরা 'ঈদ' উৎসব পালন করেন।

জলসেচ ও বিদ্যুৎ : মণিপুর রাজ্যের নদীতে ছোট ছোট বাঁধ দিয়া জল আটকাইয়া খাল যোগে সেই জল ক্ষেত-খামারে সেচন করা হয়। নিত্যবহ নদী এইভাবে জলসেচে সাহায্য করে। জলসেচের স্থবিধাযুক্ত জমির মোট আয়তন প্রায় চারি হাজার হেক্টার।

রাজ্যে তাপবিদ্যুৎ উৎপাদন হয় বৎসরে গড়ে ৩·৫ মেগাওয়াট। ১৯৭৪ খ্রীষ্টাব্দে বিদ্যুৎ উৎপাদনের মোট পরিমাণ ৭·৬ মেগাওয়াট হয়। বর্তমানে এই রাজ্যের ২১৪টি গ্রামে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হয়।

কৃষি : মণিপুর রাজ্যে কৃষিই অধিবাসীদের মুখ্য জীবিকা। রাজ্যের শতকরা ৬৬ জন লোক কৃষিজীবী। ধান রাজ্যের প্রধান ফসল। গম ও ভুট্টা সামান্য পরিমাণে উৎপন্ন হয়। খাদ্যশস্যের মোট উৎপাদন বৎসরে গড়ে প্রায় ২ লক্ষ টন। স্থানে স্থানে উপবনে নানা রকমের ফল জন্মে, তন্মধ্যে নাসপাতিই প্রধান। ইহা ভিন্ন ইক্ষু, তূলা ও তামাকের চাষ হয়। আলু, ফুলকপি ও অন্যান্য শাক-সব্জীও প্রচুর উৎপন্ন হয়। বিমানযোগে এইসব শাক-সব্জী আসাম রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে প্রেরণ করা হয়।

খনিজ সম্পদ ও শ্রমশিল্প : এই রাজ্যে খনিজ সম্পদের অনুসন্ধানকার্য চলিতেছে। আশাপ্রদ কোন তথ্য এখনও পর্যন্ত মিলে নাই।

এই রাজ্যে কোন বৃহৎ শিল্পকারখানা নাই। ১৯৭৩ খ্রীঃ একটি **চিনির কল** স্থাপিত হয়। কারখানাটি দেশী চিনি প্রস্তুত করে। তাঁত-শিল্পই বিশেষ কুটীর শিল্প। পর্যাপ্ত তাঁতের কাপড় এই রাজ্যে প্রস্তুত হয় ও ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে রপ্তানি করা হয়। ইহা ছাড়া কুটীরশিল্পে রেশম বস্ত্র, বাঁশ ও বেতের জিনিস, কাঠের সামগ্রী, চামড়ার জিনিস, লোহার যন্ত্রাদি এবং তামা ও কাঁসার তৈজসপত্র প্রস্তুত হয়।

পরিবহণ ও বাণিজ্য : রাজ্য সরকার পরিবহণ ব্যবস্থার উন্নয়নে উদ্যোগী। এই বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকার সাহায্য করিতেছেন। নাগাল্যাণ্ড রাজ্যের **ডিমাপুর** হইতে প্রশস্ত পাকা রাস্তা **কোহিমা** ও **মাও** হইয়া এই রাজ্যের রাজধানী **ইম্ফল** পর্যন্ত প্রসারিত। এই পথে মোটরযানে যাত্রী যাতায়াত করে ও প্যণসামগ্রী পরিবহণ করা হয়। বর্তমানে আসাম রাজ্যের কাছাড় জিলার **শিলচর** রেল ষ্টেশন হইতে অপর একটি রাজপথ **জিরিঘাট** হইয়া **ইম্ফল** পর্যন্ত আসিয়াছে। রাজ্যের ভিতরে ছোট ছোট রাজপথে যাতায়াত করা হয়।

এই রাজ্যে কোন রেলপথ নাই। পার্শ্ববর্তী রাজ্যের রেলষ্টেশন **ডিমাপুর** ও **শিলচর** হইতে মোটরযোগে মাল ও যাত্রী চলাচল করে। এই রাজ্যে একমাত্র

বিমানঘাঁটি ইম্ফল। পণ্যসামগ্রীর মধ্যে **রপ্তানী** বস্তু হইল—কুটীরশিল্পজাত তাঁত বস্ত্র, রেশম বস্ত্র, কাঠ, বাঁশ ও বেতের সামগ্রী, মশলা ও ফল ইত্যাদি এবং **আমদানী সামগ্রী** বলিতে লবণ, কেরোসিন তৈল, খাদ্যসামগ্রী, সিমেণ্ট, প্রসাধন সামগ্রী, যানবাহন, বয়নশিল্প সামগ্রী, বৈদ্যুতিক সাজ-সরঞ্জাম ও ঔষধ প্রভৃতি প্রধান।

প্রসিদ্ধ স্থান ঃ ইম্ফল—মণিপুর রাজ্যের রাজধানী। এখানে কয়েকটি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও কলেজ আছে। **শাগোলবন্ধ**—ইহা ইম্ফল শহরের অনতিদূরে অবস্থিত। প্রবাদ যে, এখানে তৃতীয় পাণ্ডব অর্জুনের সহিত মণিপুর রাজকুমার বভ্রুবাহনের যুদ্ধ হয়। **মাও**—ডিমাপুর ইম্ফল রাজপথের মধ্যস্থলে অবস্থিত ব্যবসাকেন্দ্র।

ত্রিপুরা

সূচনা ঃ এই রাজ্যটি প্রাক্ স্বাধীনতা যুগে মহারাজা শাসিত দেশীয় রাজ্য ছিল। দেশের স্বাধীনতা লাভের পর ভারতের অন্যান্য দেশীয় রাজ্যের মত এই রাজ্যও ভারত যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হয়। প্রথমে ইহা কেন্দ্রশাসিত এলাকা ছিল। ১৯৭২ খ্রীঃ ২১শে জানুয়ারী ইহাকে রাজ্যপাল শাসিত রাজ্যস্তরে উন্নীত করা হয়। আসামের রাজ্যপাল ত্রিপুরারও রাজ্যপাল। উচ্চ শিক্ষা বিষয়ে এই রাজ্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষাব্যবস্থা ত্রিপুরা সরকারের শিক্ষাবিভাগের নিয়ন্ত্রণে পরিচালিত হয়।

অবস্থান ও ভূপ্রকৃতি ঃ ইহা ভারত যুক্তরাষ্ট্রের পূর্ব-সীমান্তবর্তী একটি পার্বত্য রাজ্য। এইজন্য ইহার গুরুত্ব সমধিক। ইহার উত্তরে, দক্ষিণে ও পশ্চিমে বাংলাদেশ, পূর্বে মিজোরাম ও আসাম রাজ্যের কাছাড় জিলা।

ইহার আয়তন ১০,৪৭৭ বর্গ কিলোমিটার। এই রাজ্যে পাহাড় ও উপত্যকা দুই-ই আছে। পাহাড়গুলির মধ্যে **বড়মুড়া, আঠারোমুড়া, লংতরাই ও জামপুইটা** প্রধান। এই রাজ্যে **গোমতী, মনু, খোয়াই, ধলাই ও হাওড়া** নদী প্রবাহিত। ইহাদের মধ্যে অধিকাংশই সারা বৎসর নাব্য নহে। তবে উহাদের সব কয়টি নদী দিয়াই বনজ সম্পদ কাঠ, বাঁশ ও বেত প্রভৃতি সামগ্রী সমভূমিতে সহজে সরবরাহ করা যায়।

জলবায়ু ঃ ত্রিপুরার জলবায়ু উষ্ণ ও আর্দ্র। এখানে মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে বৃষ্টিপাত প্রচুর হয়।

উদ্ভিদ ঃ মৌসুমী বায়ুতে প্রচুর বৃষ্টিপাত হওয়ার জন্য এই রাজ্য অরণ্যময় এবং **চিরহরিৎ** বৃক্ষে পূর্ণ। রাজ্যে ৬০ শতাংশে বনভূমি বিদ্যমান। এই রাজ্যের পার্বত্য

[স্কেল ১ সেন্টিমিটার=১৩ কিলোমিটার]

অঞ্চলে শাল, সেগুন, ছাতিম, মেহগিনি, গামাইর, চাম ও সুন্দী প্রভৃতি সারবান্ বৃক্ষ ও নানাপ্রকার বাঁশ ও বেত জন্মে। ছাতার বাঁট ও কাগজ তৈয়ারী করিতে এই রাজ্যের বাঁশ ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে রপ্তানি হয়।

অধিবাসী ঃ এই রাজ্যে প্রায় ১৫·৬ লক্ষ লোকের বাস। এই রাজ্যের আদিম অধিবাসী হইল ত্রিপুরী, রিহাং, চাকমা ও মিজো প্রভৃতি পার্বত্য জাতি। এতদ্ভিন্ন বাঙ্গালী, মণিপুরী ও চা শিল্পে শ্রমজীবী হিসাবে অন্যান্য রাজ্যের লোকও এই রাজ্যে বাস করে। অধিবাসীদের মধ্যে বাঙ্গালীরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ। বাংলাই ত্রিপুরা রাজ্যের প্রধান ও সরকারী ভাষা। ত্রিপুরা রাজ্যের ভূতপূর্ব মহারাজারা বাংলা ভাষার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন।

জলসেচ ও জলবিদ্যুৎ ঃ রাজ্যটিতে নলকূপের সাহায্যে জলসেচ প্রকল্প কার্যকরী হইয়াছে। ৬৩টি সেচ পরিকল্পনার কাজ শেষ হইয়াছে। অতিরিক্ত ২টির কাজ অচিরেই শেষ হইবে। সেচের সকল পরিকল্পনা কার্যকরী হইলে রাজ্যে ৮৯০ হেক্টার জমি জলসেচের অধীনে আসিবে।

রাজ্যে বর্তমানে ৫ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন হয় ; ইহা ছাড়া মেঘালয় রাজ্যের বড়পানি ও উমক্র উৎপাদন কেন্দ্র হইতে ২·৪ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ পাওয়া যায়। চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার শেষে রাজ্যে ১০ হাজার কিলোওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন হইবার কথা ছিল। বর্তমানে ডিজেল যন্ত্রে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হয়। **গোমতী জলবিদ্যুৎ** কারখানার নির্মাণকার্য শেষ হইলে এই রাজ্যে প্রচুর জলবিদ্যুৎ উৎপাদিত হইবে। তখন এই রাজ্যে ও পার্শ্ববর্তী রাজ্যগুলিতে প্রয়োজনমত বিদ্যুৎ সরবরাহ করা সম্ভব হইবে।

কৃষি ঃ ত্রিপুরা রাজ্যের মাত্র ৭ শতাংশ আবাদী জমিতে জলসেচ হয়। কাজেই কৃষির জন্য বৃষ্টির উপর নির্ভর করিতে হয়। এই রাজ্যের অধিকাংশ পার্বত্য জাতি পাহাড়ের উপর বাস করেন। তাঁহারা 'জুম' প্রথায় পাহাড়ের উপরে ধান, তিল, তুলা ও শাক-সব্জী উৎপাদন করেন। নিম্ন সমভূমিতে আধুনিক প্রথায় চাষ-আবাদ করা হয়। রাজ্যের প্রধান কৃষিজ ফসল **ধান**। এই রাজ্যে পাট, মেস্টা, তৈলবীজ ও ডাল উৎপন্ন হয়। তুলা, ইক্ষু, চীনাবাদাম ও শাকসব্জীর চাষ হয়। ফলের মধ্যে আনারস, লিচু, কলা, কমলালেবু, আম ও কাঁঠাল প্রধান। এই রাজ্যে অনেকগুলি চা-বাগান আছে। এই রাজ্যে চায়ের জমির আয়তন ৫৩৭৬ হেক্টার। এইগুলিতে প্রচুর চা উৎপন্ন হয় ; বার্ষিক উৎপাদন কমপক্ষে ২৯·৬ লক্ষ কিলোগ্রাম। রাজ্যে ১৯৭৩-৭৪ খ্রীঃ ৩·৭ লক্ষ টন চাউল উৎপন্ন হয়।

খনিজ সম্পদ ও শিল্প ঃ এই রাজ্যের বড়মুড়া পাহাড়ে খনিজ তৈলের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। এখানে পরীক্ষামূলক খননকার্য চলিতেছে। এই রাজ্যে **চা**-শিল্পই বৃহৎ শিল্প। রাজ্যে ৫৫টি চা-বাগান বিদ্যমান। চা-বাগানের মোট আয়তন ৫৩৭৬ হেক্টার এবং বার্ষিক উৎপাদন প্রায় ২৯·৬ লক্ষ কিলোগ্রাম। তাঁত শিল্প ও অন্যান্য কারিগরি শিল্প **কুটীরশিল্পের** অন্তর্গত। রাজ্য সরকার শিল্প কারখানার উন্নয়নে উদ্যোগী। এই রাজ্যে কাঁচামালের অভাব নাই। অধিবাসীরা কর্মঠ ও উদ্যোগী। এই অঞ্চলে কাগজ প্রস্তুতের উপযুক্ত বাঁশ ও কাঠ প্রচুর রহিয়াছে। বর্তমানে কুমারঘাটের নিকটে **ফটিকরায়** নামক স্থানে একটি কাগজের কল স্থাপনের কাজ ভালভাবেই চলিতেছে।

পরিবহণ ও বাণিজ্য ঃ এই রাজ্যে **ধর্মনগর** পর্যন্ত রেলপথ আছে। রাজপথের মধ্যে **আসাম-আগরতলা** পাকা রাজপথই প্রধান। এই রাজপথই ত্রিপুরা রাজ্য ও আসাম রাজ্যের তথা ভারত যুক্তরাষ্ট্রের অন্যান্য রাজ্যের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করে। রাজ্যের অভ্যন্তরের রাজপথগুলি অন্যান্য মহকুমা শহরের সহিত রাজধানী আগরতলার সংযোগ স্থাপন করিয়াছে।

বিমানপথই ত্রিপুরা রাজ্যের সহিত পশ্চিমবঙ্গের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রক্ষা করিতেছে। এই রাজ্যে আগরতলার নিকট **সিঙ্গারবিলে** একটি বিমানঘাঁটি আছে। ইহা ছাড়া **খোয়াই, কমলপুর** ও **কৈলাসহরে** (Kailasahar) বিমানঘাঁটি আছে। বিমানপথে যাত্রী যাতায়াত করে ও পণ্যসামগ্রী পরিবহণ করা হয়।

কুটীর-শিল্পজাত তাঁতের কাপড়, বাঁশ ও বেতের সামগ্রী, চা ও ফল, রাজ্যটি **রপ্তানি** করে। যন্ত্রপাতি, যানবাহন, সিমেণ্ট, ঔষধ, বিলাসদ্রব্য, ধাতব সামগ্রী, লবণ, কেরোসিন তৈল, পেট্রোল ও বৈদ্যুতিক সাজ-সরঞ্জাম রাজ্যটি **আমদানি** করে।

প্রসিদ্ধ স্থান ঃ আগরতলা—এই রাজ্যের রাজধানী। **ধর্মনগর**—ধর্মনগর মহকুমার সদর শহর। ইহাই এই রাজ্যের প্রান্তিক রেলষ্টেশন। অপর রেলষ্টেশন **চোরাইবাড়ি। উদয়পুর**—হিন্দুদের তীর্থস্থান। এখানে **ত্রিপুরেশ্বরী** কালীমন্দির প্রসিদ্ধ। **কমলপুর, খোয়াই, কৈলাসহর, বিলোনিয়া, সাব্রুম, অমরপুর** ও **সোনামুড়া** ত্রিপুরা রাজ্যের অন্যান্য প্রসিদ্ধ স্থান। **উনকোটি**—কৈলাসহরের অনতিদূরে উনকোটি পাহাড়ের উপর অবস্থিত হিন্দুদের তীর্থস্থান। প্রতি বৎসর শিবরাত্রি উপলক্ষে এখানে বহু যাত্রীর সমাগম হয়। এখানে প্রস্তরখোদিত অনেক দেবদেবীর মূর্তি বিদ্যমান। এই মূর্তিসমূহ প্রাচীন ভাস্কর্যের অপূর্ব নিদর্শন।

অনুশীলনী

১। মণিপুর ও ত্রিপুরা রাজ্যের কুটীরশিল্পের বিবরণ দাও।

২। মেঘালয় রাজ্যটি শিল্পে অনুন্নত কেন? এই অংশের খনিজ সম্পদের উপর নির্ভর করিয়া কোন্ কোন্ শিল্প গড়িয়া তোলা যায়?

৩। চেরাপুঞ্জী অঞ্চলে অত্যধিক বৃষ্টিপাত হয় কেন? শিলং শহরে চেরাপুঞ্জী অপেক্ষা কম বৃষ্টি—কারণ দেখাও।

৪। সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও ঃ—

আগরতলা, কমলপুর, কোহিমা, বিলোনিয়া, কুমারঘাট।

৫। মেঘালয়, মণিপুর, নাগাল্যাণ্ড ও ত্রিপুরা রাজ্যগুলি ভারতের কোন দিকে অবস্থিত? উহাদের পার্বত্য রাজ্য বলা হয় কেন?

৬। ভারতের উত্তর-পূর্ব ও পূর্ব ভাগে পার্বত্য রাজ্যগুলির রপ্তানি-সামগ্রী কি কি? রপ্তানি সামগ্রীর রপ্তানি-পরিমাণ বৃদ্ধির জন্য কি করা উচিত?
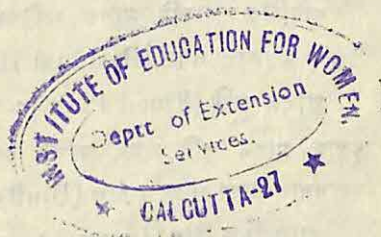
পরিশিষ্ট

কয়েকটি ভৌগোলিক পারিভাষিক শব্দের সংজ্ঞা

ভূ-গঠন ও ভূ-প্রকৃতি (Structure and Relief): ভূ-গঠন বলিতে স্তরে স্তরে সাজান শিলা দ্বারা গঠিত ভূ-গর্ভ হইতে ভূত্বক পর্যন্ত ভূভাগকে বুঝায়। ভূত্বকে ভূমির রূপ যেখানে পর্বত, মালভূমি, সমভূমি ও নিম্নভূমি দৃষ্ট হয়, উহাকে ভূ-প্রকৃতি বলে। ভূ-গঠনের উপর ভূপ্রকৃতি অনেকটা নির্ভর করে।

মালভূমি (Plateau): মালভূমির সাধারণ উচ্চতা ৫০০ হইতে ১০০০ মিটার। উহা উচ্চ এবং প্রায় সমতলভূমি। যেমন, দাক্ষিণাত্যের মালভূমি। কোন কোন মালভূমির গড় উচ্চতা ৪০০০ মিটার অপেক্ষা অধিক দেখা যায়। উহাদের সংখ্যা বেশী নয়। তিব্বতের মালভূমি প্রায় ৪০০০ মিটার উচ্চ এবং পৃথিবীর সর্বোচ্চ মালভূমি পামীর মালভূমির উচ্চতা ৪০০০ মিটারের অধিক।

ব্যবচ্ছিন্ন মালভূমি (Dissected plateau): মালভূমি নানাভাবে সৃষ্ট হইতে পারে। ভূভাগের দুই পাশ বসিয়া গেলে, মাঝের ভূভাগ মালভূমির আকার ধারণ করে। ভূ-আলোড়নের ফলে ইহা সম্ভব হয়। অনেক সময় অগ্নি-উৎপাতে লাভা সঞ্চিত হইলে মালভূমির সৃষ্টি হয়। আবার পর্বতের শিলাস্তরের কঠিনতার তারতম্যে কোমল শিলাস্তর ক্ষয়প্রাপ্ত হইলে, অধিকতর কঠিন শিলাস্তর মালভূমির আকার ধারণ করে। এইভাবে রচিত মালভূমি ক্ষয়ীকরণে বিভিন্ন অংশে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িলে, ব্যবচ্ছিন্ন মালভূমির সৃষ্টি হয়।

ব্যবচ্ছিন্ন মালভূমি আরও ক্ষয়ীকরণের ফলে কতকগুলি টিলায় পরিণত হয়। ঐগুলি ক্ষয়জাত পর্বত (Residual Hill) নামে অভিহিত হয়।

প্লাবন ভূমি (Flood Plain): নদীর নিম্ন অববাহিকায় বন্যার সময় প্লাবিত ভূভাগ প্লাবন ভূমি নামে কথিত হয়। প্লাবন ভূমির সীমারেখায় নদী বরাবর সমান্তরাল খাড়া পাড়কে ব্লাফ (Bluff) বলা হয়।

প্রাকৃতিক বাঁধ (Levees): বন্যার সময় নদীর দুই কূল প্লাবিত হয়। বন্যার জল সরিয়া গেলে, সঞ্চিত পলি নদী হইতে কিছু দূরে সমান্তরাল ভাবে এক বাঁধের সৃষ্টি
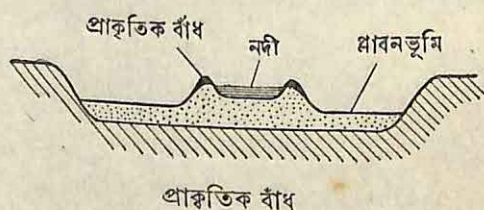
প্রাকৃতিক বাঁধ

করে। পুনঃপুনঃ সঞ্চয়ের ফলে বাঁধটি বেশ উচু হইয়া উঠে। ইহাই 'প্রাকৃতিক বাঁধ'।

ভাবর (Bhabar)—হিমালয়ের পাদদেশে উচ্চগাঙ্গেয় সমভূমির উত্তর প্রান্তে নানা প্রকার প্রস্তরখণ্ড মিশ্রিত সংকীর্ণ যে ভূমিভাগ আছে, উহাকে ভাবর বলা হয়। অনেক পার্বত্য ক্ষুদ্র নদী এই প্রস্তরময় অঞ্চলে প্রবেশ করিয়া অদৃশ্য হইয়া যায় এবং পার্শ্ববর্তী নীচু জায়গায় জলাভূমির সৃষ্টি করে। ভাবর অঞ্চলে বড় বড় বৃক্ষ জন্মে।

ভাঙ্গর (Bhangar)—সমভূমির প্রাচীন পলিমাটিকে ভাঙ্গর বলা হয়।

খাদার (Khadar)—সমভূমির নূতন পলিমাটিকে বলা হয় খাদার।

পেডিপ্লেন (Pediplain) : শুষ্ক ও অর্ধশুষ্ক অঞ্চলে পাহাড়ের কিনারার চারিধারে পাথর ছড়ানো যে ঢালু সমভূমি দেখা যায়, উহাকেই পেডিপ্লেন বলে।

সমপ্রায় সমভূমি (Peneplain) : দীর্ঘকাল ব্যাপী ক্ষয়ীকরণে ভূত্বক এক সমতায় নীত হয়। সেই সময় স্থানীয় উচ্চতা অনেকটা সমুদ্রপৃষ্ঠের সহিত এক উচ্চতায় আসিয়া পড়ে। তখন সমুদ্রজল ভূ-পৃষ্ঠের ঐ অংশ নিমগ্ন করে। এই ভূমিরূপ ভূ-পৃষ্ঠের বার্ধক্য অবস্থায় সম্ভব।

মনাডনক (Monadonock) : ভূ-গঠনে ভিন্ন কাঠিন্যের শিলার ক্ষয়ীকরণে তুলনামূলকভাবে কমবেশী ক্ষয়ের ফলে স্থানে স্থানে টিলা দেখা দেয়। ঐগুলি **'মনাডনক'** নামে পরিচিত।

শিলা (Rock) : ভূ-গর্ভ হইতে ভূত্বক পর্যন্ত যে উপাদান দিয়া ভূ-ভাগ স্তরে স্তরে সাজান, তাহাকে এক কথায় 'শিলা' বলে। শিলা খনিজের সংমিশ্রণ মাত্র। উৎপত্তি

শিলার প্রকারভেদ

ভঙ্গিল পর্বত
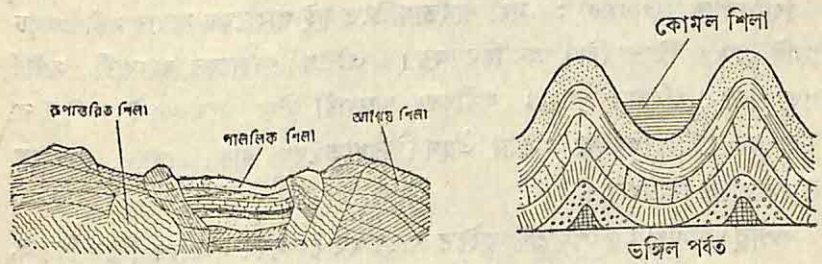
অনুযায়ী উহা তিন প্রকার—(ক) প্রাথমিক বা আগ্নেয় শিলা (খ) পাললিক বা স্তরীভূত শিলা এবং (গ) রূপান্তরিত বা পরিবর্তিত শিলা। গ্রানাইট ও বেসল্ট, এইগুলি

প্রাথমিক বা আগ্নেয় শিলা। বেলেপাথর, চুনাপাথর ও পলি পাললিক শিলার অন্তর্গত। নীস ও মার্বেল রূপান্তরিত শিলা।

ভৌমজল (Ground water) : ভূ-পৃষ্ঠে যে বৃষ্টির জল পড়ে, উহার কিছুটা বাষ্পীভূত হয়, কিছুটা আবার নদী-প্রবাহ হিসাবে প্রবাহিত হইয়া সাগর, উপসাগর, মহাসাগর রচনা করে। এছাড়া কিছুটা প্রবেশ্য শিলার মধ্য দিয়া চুঁয়াইয়া, উহা ভূগর্ভে অপ্রবেশ্য শিলার উপর সঞ্চিত হয়। অপ্রবেশ্য শিলার উপর সঞ্চিত ঐ জলকে 'ভৌম জল' বলে।

হিমবাহ (Glacier) : চলমান বিশাল বরফের 'স্তূপকে' হিমবাহ বলে। মেরুপ্রদেশ ও সু-উচ্চ পর্বতশৃঙ্গে 'হিমবাহ' দেখা যায়। হিমবাহ দ্বারা ভূপৃষ্ঠের ক্ষয় সাধিত হয়। হিমালয়ের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য হিমবাহের নাম—জেমু, কাঞ্চনজঙ্ঘা, কেদারনাথ, গঙ্গোত্রী।
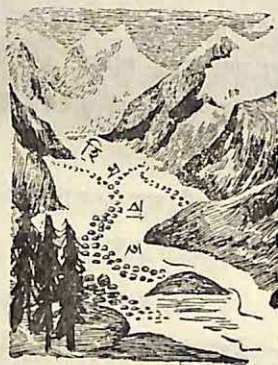
হিমবাহ

গিরিখাত

গিরিখাত (Gorge) : নদী পার্বত্যগতিতে দুই পাহাড়ের মধ্যের সঙ্কীর্ণ অথচ খাড়াই পথের ভিতর দিয়া প্রবাহিত হয়। এইরূপ পাহাড়ের মধ্যবর্তী সঙ্কীর্ণ উপত্যকাকে 'গিরিখাত' বলে। ক্ষয়ীকরণ অনুযায়ী উহা অনেকটা ইংরাজী I বা V-এর মত হয়। হিমালয় অঞ্চলে ঐরূপ গিরিখাত দেখা যায়। যেমন, নেপালে কুশী নদীর ছত্র গিরিখাত।

স্পার (Spur) : শৈলশ্রেণী হইতে বাহুর মত যে পর্বত সামনের দিকে বিস্তৃত, উহাকে 'স্পার' বলে।

ডাইক (Dyke) : ভূ-আলোড়নে কখনও কখনও গলিত লাভা বা মাগমা (Magma) ভূ-গর্ভস্থ শিলার ফাটলে নীত হয়। সেখানে জমাট বাঁধিয়া যে কঠিন শিলাস্তর সৃষ্টি করে উহাকে 'ডাইক' বলে। ডাইক উদ্‌বেধী (Intrusive) শিলা।

সমোন্নতি রেখা (Contour lines)ঃ ভূ-পৃষ্ঠে সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে এক উচ্চতা-বিশিষ্ট স্থানগুলি যদি এক রেখার দ্বারা যুক্ত হয় তবে ঐ রেখাকে সমোন্নতি রেখা বলে। মানচিত্রে সমোন্নতি রেখার দ্বারা ভূ-পৃষ্ঠের উচ্চতা বুঝান হয়।

গ্রস্ত উপত্যকা (Rift Valley)ঃ ভূ-আলোড়নে অনেক সময় কঠিন শিলা ফাটিয়া ভারসাম্য বজায় রাখিতে, এক অংশ বসিয়া যায় বা শিলাস্তরের দুই অংশে ফাটল ধরিয়া মাঝখান বসিয়া যায়। ইহা 'চ্যুতখাত' (Fault Trough)। চ্যুতখাত দিয়া নদী প্রবাহিত হইলে, গ্রস্ত উপত্যকার (Rift Valley) সৃষ্টি হয়।

গ্রস্ত উপত্যকা এবং বিভিন্ন শিলাস্তর
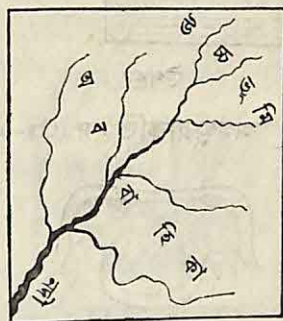
নদীর অববাহিকা

অববাহিকা (Basin)ঃ নদী বা উপনদী যে অঞ্চলের জল নিষ্কাশনে সাহায্য করে, সেই অঞ্চলটিকে নদী বা উপনদীর **অববাহিকা** বলে।

সীমান্ত চ্যুতি (Boundary Fault)ঃ দুই ধরণের ভূ-গঠনের সীমানায় যে চ্যুতি দেখা যায়, উহা 'সীমান্ত চ্যুতি'।

উপনদী (Tributary)ঃ যে জলস্রোত পর্বত বা হ্রদ হইতে উৎপত্তি লাভ করিয়া অন্য এক নদীতে মিশে, তাহাকে উপনদী বলে। ময়ূরাক্ষী ভাগীরথী নদীর উপনদী।

উপহ্রদ (Lagoon)ঃ উপকূলের নিকটে অগভীর সমুদ্রের কোন অংশ বালুকা বা সঙ্কীর্ণ ভূভাগদ্বারা পরিবেষ্টিত হইলে যে হ্রদের সৃষ্টি হয়, তাহাকে উপহ্রদ বলে। উপহ্রদের একদিক অনেক সময় সমুদ্রের সহিত অগভীর খাতে যুক্ত থাকে। উড়িষ্যায় চিল্কা হ্রদ এবং মালাবার উপকূলের হ্রদগুলিকে উপহ্রদ বলে।

বদ্বীপ (Delta)ঃ নদী সমুদ্রে প্রবেশের পর বাহিত পদার্থসমূহ অগভীর সমুদ্র-তলে থিতাইয়া পড়ে। ক্রমে ঐ সঞ্চিত পদার্থসমূহের দ্বারা নদীর মুখে দ্বীপ গঠিত হয়। নদী উহার পার্শ্ব দিয়া শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত হইয়া সমুদ্রে পতিত হয়। নদী-

মুখের এইরূপ দ্বীপকে 'বদ্বীপ' বলে। ঐসব দ্বীপের আকার সাধারণতঃ ত্রিকোণ মাত্রাহীন 'ব' অক্ষরের আকৃতিবিশিষ্ট হয় বলিয়া উহাদের বদ্বীপ বলে।

উপহ্রদ
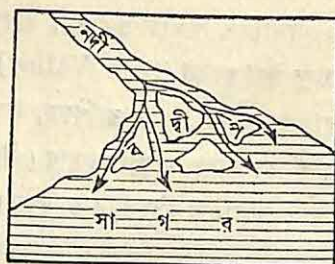
বদ্বীপ

অশ্বক্ষুরাকৃতি হ্রদ (Ox-bow lake) : নদীর নিম্নগতিতে নদীগর্ভে ক্ষয়ীকরণ শিথিল হইয়া পড়ে। সেই সময় নদী-বাহিত পলিরাশি অবক্ষেপণ করে নদীর বিভিন্ন বাঁকে। সঞ্চিত পলিরাশি নদীকে পুরাতন খাত হইতে বিচ্ছিন্ন করিলে, ছোট ছোট হ্রদের সৃষ্টি হয়। সাধারণতঃ হ্রদগুলির আকৃতি অশ্বক্ষুরের মত হয় বলিয়া হ্রদগুলিকে অশ্বক্ষুরাকৃতি হ্রদ বলে।
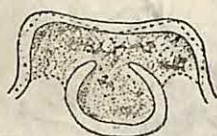
অশ্বক্ষুরাকৃতি হ্রদ

জিওসিনক্লাইন (Geosyncline) : দৈর্ঘ্যে বহুদূর বিস্তৃত ভূত্বকের এক অবনত অংশকে জিওসিনক্লাইন বলে। এই অংশে ক্ষয়িত পলিস্তরের অবক্ষেপণে খাতটি আরও অবনমিত হইতে পারে। সাধারণতঃ ভূত্বকে জিওসিনক্লাইন অংশটি দুর্বলতম। তিব্বতের মালভূমির দক্ষিণে ও ভারতের গণ্ডোয়ানা ভূমির উত্তরে একসময় বিস্তীর্ণ জিওসিনক্লাইন—টেথিস সাগর (Tethys Sea) নামে বিদ্যমান ছিল। আজকের দিনে সেখানে হিমালয় পর্বতমালা দণ্ডায়মান এবং উহার পাদদেশে বিস্তৃত সমভূমি—সিন্ধু গাঙ্গেয় ব্রহ্মপুত্র সমভূমি।

দোয়াব (Doab) : দুই নদীর মধ্যবর্তী অববাহিকা অঞ্চলকে 'দোয়াব' বলে। দো—দুই ; অব—নদী।

নিরক্ষীয় অঞ্চল (Equatorial Region) : নিরক্ষরেখার উত্তর ও দক্ষিণে ৫ অক্ষাংশ পরিমিত ভূ-পৃষ্ঠকে নিরক্ষীয় অঞ্চল বলে।

ক্রান্তীয় অঞ্চল (Tropical Region) : নিরক্ষ রেখার উত্তর ও দক্ষিণে ২৩°৩০´ অক্ষরেখাদ্বয় যথাক্রমে কর্কট ক্রান্তি ও মকর ক্রান্তি নামে পরিচিত। ঐ দুই অক্ষাংশের মধ্যবর্তী ভূ-পৃষ্ঠকে ক্রান্তীয় অঞ্চল বলে।

হিমাঙ্ক (Freezing Point)ঃ যে তাপমাত্রায় জল বরফে পরিণত হয়, সেই তাপমাত্রা বা উষ্ণতাকে হিমাঙ্ক বলে। 0° সেলসিয়াস বা ৩৩° ফারেনহাইট উষ্ণতাকে 'হিমাঙ্ক' বলে।

স্ফুটনাংক (Boiling Point)ঃ যে তাপমাত্রায় জল বাষ্পে পরিণত হয় উহাকে স্ফুটনাঙ্ক বলে। ১০০° সেলসিয়াস বা ২১২° ফাঃ উষ্ণতাকে স্ফুটনাঙ্ক বলে।

সমতাপ রেখা (Isothermal line)ঃ ভূ-পৃষ্ঠে সমতাপবিশিষ্ট স্থানগুলি যদি কোন রেখার দ্বারা যুক্ত হয়, সেই রেখাটিকে সমতাপ রেখা বলে।

সমচাপ রেখা (Isobar)ঃ ভূ-পৃষ্ঠে সমচাপ বিশিষ্ট স্থানগুলি যে রেখার দ্বারা যুক্ত সেই রেখাটিকে সমচাপ রেখা বলা হয়।

সমবৃষ্টিপাত রেখা (Ischyet)ঃ ভূত্বকে সম বারিপাত বিশিষ্ট স্থানগুলি যে রেখার দ্বারা যোগ করা হয়, সেই রেখাটি সমবৃষ্টিপাত রেখা নামে পরিচিত।

ল্যাটেরাইট (Laterite)ঃ এইটি ক্রান্তীয় অঞ্চলের মৃত্তিকা-বিশেষ। এই মৃত্তিকার রং লাল এবং উপরকার আবরণ কঠিন স্তরের। উপরকার স্তরে খনিজ লৌহ-মৃত্তিকা অধিক থাকে। নীচের স্তরে সাদা সিলিকা বা কেওলিন যুক্ত কাদা মাটি থাকে।

রেগুর (Regur)ঃ দাক্ষিণাত্যের কৃষ্ণমৃত্তিকা রেগুর নামে কথিত হয়। এই মাটিতে ক্ষার চূণের উপাদান অধিক থাকে বলিয়া এই মাটি উদ্ভিদ খাদ্যপ্রাণে পূর্ণ। অনেক সময় এই মাটিতে লাভা বা জৈব পচানি থাকায় উর্বরতা বৃদ্ধি পায়।

লোহিত মৃত্তিকা (Red soils)ঃ ক্রান্তীয় অঞ্চলের লাল মাটি লোহিত মৃত্তিকা নামে কথিত হয়। এই মাটিতে অম্লরস অধিক থাকায় কৃষিকার্যের ততটা উপযুক্ত নয়। সাধারণতঃ আগ্নেয়শিলা ক্ষয়ীকরণে ইহার উৎপত্তি হয়।

জল-বিভাজিকা (Water-parting)ঃ দুই নদীর মধ্যভাগে অবস্থিত উচ্চভূমিকে জল-বিভাজিকা বলে। সোভিয়েট ইউনিয়নের ভাণ্ডাই পর্বতটি জল-বিভাজিকা। ভারতে 'দিল্লী শিরা' (Delhi Ridge) শতদ্রু ও গঙ্গা অববাহিকাদ্বয় পৃথক করে, সুতরাং দিল্লী শিরাও একটি জল-বিভাজিকা।

বিষুব রেখা (Equator)ঃ যে কাল্পনিক রেখা উত্তর ও দক্ষিণ মেরুকে সমান দূরে রাখিয়া ভূ-পৃষ্ঠকে পূর্ব-পশ্চিমে বেষ্টন করে, সেই রেখাটিকে বিষুব রেখা বা নিরক্ষ রেখা বলে। উহার মান ০° (শূন্য ডিগ্রী)।

অক্ষরেখা (Line of Latitude): বিষুব রেখার সমান্তরাল যে কাল্পনিক রেখা উত্তর ও দক্ষিণে পৃথিবীপৃষ্ঠকে বেষ্টন করে, তাহাকে অক্ষরেখা বলে। নিরক্ষরেখা হইতে উত্তর ও দক্ষিণে কোন কৌণিক দূরত্বকে অক্ষাংশ বলে। ইহা ডিগ্রী, মিনিটে মাপা হয়।

দ্রাঘিমা রেখা (Line of Longitude): দুই মেরু সংযোগ কারক অর্ধবৃত্তাকার রেখাগুলি নিরক্ষরেখার সহিত লম্বভাবে অবস্থিত। এই রেখাগুলি দ্রাঘিমা বা দেশান্তর। লণ্ডনের গ্রীনউইচ, সহরের মধ্য দিয়া মূল মধ্যরেখা টানা হয়। ইহার পূর্ব ও পশ্চিমে ১° করিয়া ১৮০টি দ্রাঘিমা রেখা টানা হয়। ১৮০° পূঃ ও ১৮০° পঃ দ্রাঘিমা একই সম্মিলিত রেখা।